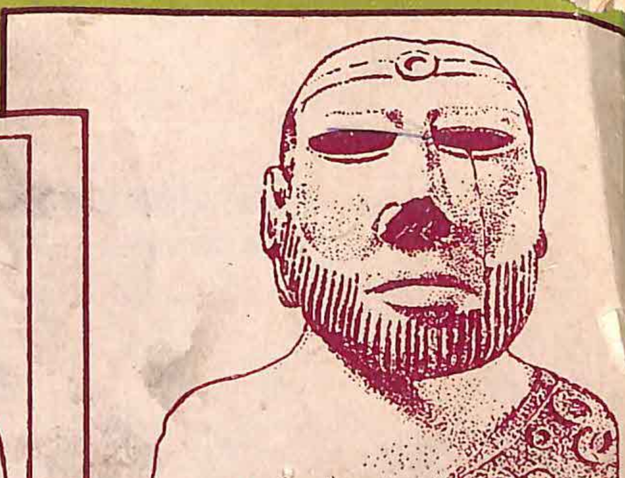
ইতিহাস পরিচয়

প্রথম ভাগ

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য





সুভাষচন্দ্র মজুমদার

Recommended by the W. B. Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI Vide notification No.
TB VI/H/79/149 *(History) dated 26.12.79.*

ইতিহাস পরিচয়

প্রথম ভাগ

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র মজুমদার এম,এ., এলএল. বি.
ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য : [illegible] টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
সুরেশ দত্ত
মডার্ন প্রিণ্টার্স
১২ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৬৭

ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ইতিহাসের নতুন পাঠক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠক্রম রচনা উপরোক্ত কার্যসূচী রূপায়ণের প্রথম সোপান। এই পাঠ্যসূচীতে সাল, তারিখ, সম্রাট, সেনাপতির উল্লেখ নেই বল্‌লেই চলে। ইতিহাস পাঠ্যসূচীর গতানুগতিক ধারা থেকে এটি একটি মৌলিক পরিবর্তন। হাজারো খুঁটিনাটি তথ্যের ভারে মানবসমাজের প্রগতির ধারাটি নতুন পাঠক্রমে হারিয়ে যায়নি। প্রাচীন মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং সমাজে শ্রেণীভেদের সূচনার কথা পাঠক্রমটির মূল আলোচ্য বিষয়। এই মূল লক্ষ্যের কথা মনে রেখে বইটিতে গুরুভার তথ্যের সমাবেশ করা হয় নি। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে জড়িত ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের জটিল তথ্যগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। আশা করি, অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে শিক্ষকসমাজ আমার এই বর্জননীতিকে সমর্থন করবেন। লেখক হিসাবে বিষয়বস্তুর মূল কথাটি সহজে তুলে ধরতে পেরেছি কিনা, সে বিচারের ভার শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর রইল।

বইটি লেখার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর বিভাগের রীডার ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে সর্বস্তরে নিরলসভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর আশীর্বাদ আমার জীবনের এক পরম মূল্যবান সম্পদ।

ইতি—

এপ্রিল ১৯৭৯ গ্রন্থকার

HISTORY SYLLABUS

CLASS—VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

A. (*i*) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development)

(*ii*) How we come to know of ancient people

B. **Early man :**

Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man') ; Food gathering man.

Old Stone Age :

Nature of tools and implements, their uses

New Stone Age : (By 8000 B.C.)

Evolution of tools and implements.

Man—a food producer.

The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C. **Copper-Bronze Age :**

Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisations.

D. **The Early Civilisation** (3000 B.C.—1500 B.C.)

Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :

(*i*) *Mesopotamia :*

(*a*) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas. (*b*) Fertility of the soil,—crops. (*c*) Defence agains floods. (*d*) Other occupations. (*e*) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(*ii*) *Egypt :*

(*a*) Location and nature of the land ; (*b*) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ; (*c*) Trade ; (*d*) The Pyramids (examples) ; (*e*) Religious beliefs ; (*f*) Chief occupations.

(*iii*) *The Indus Valley :*

(*a*) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (*b*) Town planning ; (*c*) Food and other articles of use ; (*d*) Crafts ; (*e*) Trade ; (*f*) Worship ; (*g*) Light thrown by relics upon classification in society.

(*iv*) *China :*

(*a*) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang; (*b*) China in early times (*c*) Myths (particularly of flood).

(*v*) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. **The Iron-Age Societies :**

(*a*) Discovery and use of iron, its impact; (*b*) Main features of social and economic life; (*c*) Growth of Kingship.

I. (*i*) *Babylon :* Farming and Commerce; Temples and Priests; Learning and culture; The Code of Hamurabi —nature of society revealed by the code.

(*ii*) *Egypt as an Imperial power :* Colonies; The power of priests.

(*iii*) *Iran :* Rise of Persia; Zoroaster.

(*iv*) *The Jews :* Hebrews in Egypt : Hebrew exodus under Moses—flight from slavery.

II. *GREECE* (only in broad outlines) : An introductory note on the iufluence of Crete : The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta—their social and political life. . Athens Vs. Sparta. Cultural greatness of Athens, Literature, Arts. Religion —brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles, Sophocles. Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander— his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III. *ROME :* Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society; Particians and Plebeians; Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus). *Julius Caesar* : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. *CHINA :* "Great Shang". Confucius—his teachings. Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. *INDIA :* (a) The coming of the Aryans. (*b*) The Vedas. (*c*) Early Aryan Society, religion, and political organisation (with reference to the Vedas). (*d*) The Epics. (*e*) The rise of Jainism and Buddhism. (*f*) The Empires—a brief outline of developments from the Mauryas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (*g*) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas on the basis of proven historical materials viz inscriptions and literary evidence). (*h*) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon socieiy and trade. (*i*) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (*j*) A brief summery of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতি ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা প্রাচীন ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন? নিজেদের পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হবার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকের মনে রয়েছে, সেটাই ইতিহাস পাঠের প্রাথমিক প্রেরণা যোগায়।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম লড়াই করতে হয়েছে। সেযুগের মানুষ ছিল একান্তভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। আদি মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তই ছিল অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে ধীরে ধীরে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করতে শেখে ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। মানবসমাজের দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ইতিহাস পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষ যেকোন বাধা অতিক্রম করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম।

ইতিহাসের ঘটনা যুগে যুগে বারবার একইভাবে ঘটে না। কিন্তু একথাও সত্য যে মানবজীবনে শত শত ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম বা ছক আছে। তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের সাফল্য ও ব্যর্থতা, প্রাচীন সভ্যতার ভাঙ্গা-গড়া ইত্যাদি আলোচনা করলে মানবজীবনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু জ্ঞানলাভ করতে পারি। অতীতকালের মানবজীবন

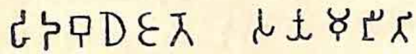
সম্পর্কে এই জ্ঞান আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এছাড়া, প্রাচীন যুগের ইতিহাস পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবীর কোন জাতিই জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। উপযুক্ত পরিবেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের উপরই মানবজীবনের অগ্রগতি নির্ভর করে। মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের প্রাচীন ইতিহাসে একথার প্রমাণ মেলে। গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভবে ক্রীটের প্রাচীন অধিবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গ্রীক সভ্যতাকে ভিত্তি করে রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীনকালের ইতিহাস জানার বিভিন্ন উপায়

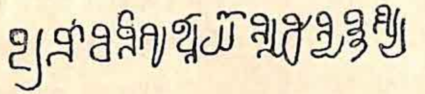
প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানঃ আনুমানিক দশ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব। অথচ আজ থেকে আনুমানিক মাত্র পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন দেশের মানুষ লিখিত ভাষার ব্যবহার শেখে। তাই প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে আমাদের নানা অলিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। মানব ইতিহাসের যে যুগে কোন লিখিত ভাষার প্রচলন ছিল না, ইতিহাসের সেই কালকে ঐতিহাসিকরা 'ইতিহাস-পূর্ব' বা 'প্রাক্-ইতিহাস' বা 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের মানুষের শিলীভূত দেহাবশেষ ও তাদের তৈরী নানা সাজসরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এইসব ধ্বংসাবশেষের অনুসন্ধান করতে হলে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও দক্ষতার প্রয়োজন। যে জ্ঞানচর্চার সাহায্যে প্রাচীন নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা করা হয়, তাকে প্রত্নতত্ত্ব বলে। আদিমতম মানুষের অস্তিত্বের কোন লিখিত বিবরণ না থাকলেও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ লিখিত ভাষার ব্যবহার শিখেছিল। ভূর্জপত্র, প্রস্তর, পর্বতগাত্র, স্তম্ভ, প্রাচীরগাত্র এবং মুদ্রা ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির অসংখ্য নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে।



(১) খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপি



(২) খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপি

এই প্রাচীন লিপিগুলি হল প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার লিখিত উপাদান। এইসব প্রাচীন লিপির সন্ধানের কাজ এখনও চলছে। অনেক লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। প্রাচীন লিপির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার যত বেশী সম্ভব হবে, প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখাটি ততই স্পষ্টতর হবে।

লিখিত ভাষার প্রচলনের পর ধীরে ধীরে নানা ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস প্রভৃতি রচনা আরম্ভ হয়। মহাভারত, রামায়ণ, বিভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস এবং চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শনের অনেকগুলি কালের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়েছে, অনেকগুলি হয়তো অনাবিষ্কৃত রয়েছে। তবু একথা বলা যায় যে, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত নানা প্রাচীন নিদর্শনগুলির সাহায্যে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান ধারাগুলি লক্ষ্য করতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

অনুশীলনী

ক। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ১। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তুমি কি জান? ২। প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

খ। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ** ১। 'ইতিহাস-পূর্ব' বা 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' কাকে বলে? কিভাবে এই যুগের ইতিহাস জানা যায়? ২। প্রত্নতত্ত্ব কাকে বলে? কিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেন? ৩। প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানগুলি কি? কোন্ সময় থেকে এই লিখিত উপাদানের সূচনা হয়েছিল? ৪। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার কোন লিখিত উপাদান আছে কি? যদি থাকে, তাহলে কয়েকটির নাম লেখ। ৫। প্রাচীন যুগের ইতিহাস পড়ে আমরা কি বুঝতে পারি?

গ। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** ১। সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :— (অ) —— সাহায্যে 'ইতিহাস-পূর্ব' বা 'প্রাক্-ইতিহাস' বা 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগের কথা জানা যায়। (প্রত্নতত্ত্বের, ভাষার, মানুষের সহজাত বুদ্ধির)। (আ) আজ থেকে প্রায় —— পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ লিখিত ভাষার ব্যবহার শিখেছিল। (দশ হাজার বছর আগে, দেড় হাজার বছর আগে, পাঁচ হাজার বছর আগে)। (ই) মহাভারত, রামায়ণ, বিভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ থেকে —— ইতিহাসের নানা তথ্য জানা যায়। (প্রাচীন মিশরের, প্রাচীন চীনের, প্রাচীন ভারতের)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদি মানুষ

আনুমানিক তিন লক্ষ খৃষ্টপূর্বাব্দে পিকিং মানুষের আগুন ব্যবহার—খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ

বানরজাতীয় কোন প্রাণীকুল থেকে আদি মানুষের উদ্ভব ঘটে। প্রাণধারণের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম ও জীবনযাত্রাপ্রণালী সুগম ও উন্নত করার জন্য দীর্ঘকালের প্রাণপণ চেষ্টার ফলেই একশ্রেণীর বানরজাতীয় প্রাণী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষে পরিণত হয়। চার হাত-পায়ের সমান ব্যবহার না করে খাদ্যের সন্ধানে হাতে [illegible] ব্যবহার করে আদি মানুষরা বানরজাতীয় পূর্বপুরুষদের থেকে পৃথ[illegible] হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখল[illegible] এই ধরণের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আনুমানিক দশ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর পূর্বে। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে আদি মানুষ বর্তমান মানুষের আকৃতি লাভ করে।

ঠিক কোন্ সময়ে মানুষ প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ১৯২৯ সালে চীনের পিকিং শহরের অনতিদূরে গুহাবাসী আদি মানুষের দেহাবশেষ ও নানা সাজসরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানেই মানুষের আগুন ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে। গুহাবাসী এই আদি মানুষকে 'পিকিং মানুষ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত দুই থেকে পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে 'পিকিং মানুষ'রা আগুনের ব্যবহার শেখে। অগ্ন্যুৎপাৎ, দাবানল বা অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনাই হয়তো মানুষকে আগুন ব্যবহারের প্রেরণা যোগায়। প্রাকৃতিক কোন কারণে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, আগুন সম্পর্কে মানুষের আদিম ভয়কে জয় করে পিকিং মানুষরা সে আগুন আর নেভায় নি। স্বেচ্ছায় আগুন জ্বালানো বা নিভানো শিখতে হয়তো তাদের

কয়েক হাজার বছর লেগেছিল। আগুন ব্যবহারের ক্ষমতা আদি মানুষের অগ্রগতির এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। রাত্রির অন্ধকার, শীতের তীব্রতা কিম্বা বন্য প্রাণীর আক্রমণ মানুষের কাছে আর বিভীষিকার বস্তু নয়। এবার থেকে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করার পথে পা দিল।

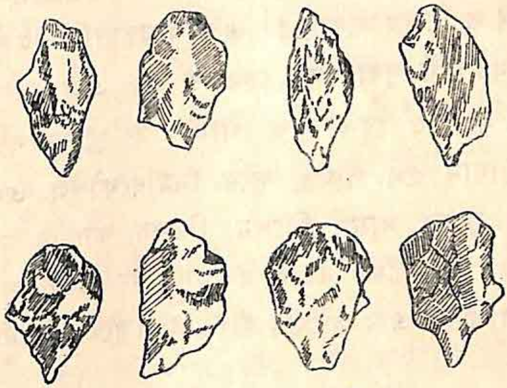
অরণ্যচারী, গুহাবাসী আদিম মানুষ প্রাণধারণের জন্য একান্ত-ভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। পশুপাখীর মাংস ও গাছের ফলমূল ছিল আদি মানুষের আহার্য বস্তু। গাছের ছাল, পাতা কিম্বা পশুচর্ম ছিল মানুষের পোশাক। খাদ্য উৎপাদনের কোন অভিজ্ঞতা পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের ছিল না। তাই খাদ্য-সংগ্রহের প্রয়োজনে তারা একস্থান থেকে অন্যত্র ঘুরে বেড়াতো। এযুগের মানুষ ছিল যাযাবর।

প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগ—নানা যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ প্রাচীন যুগে মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান এবং এগুলির নির্মাণকৌশলের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে প্রাচীন ইতিহাসকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ—(১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ, (২) নব প্রস্তর যুগ, (৩) তাম্র—ব্রোঞ্জ যুগ এবং (৪) লৌহ যুগ। অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র কখনও একই সময়ে একই ধরণের উপকরণে নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়নি। দেখা গেছে যে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের মানুষ যখন লোহার তৈরী জিনিসপত্র ও অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত, তখন অন্যত্র মানুষ পাথরের তৈরী জিনিষও দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ ও ব্যবহার করতে শেখেনি। আজও আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে উন্নতির যথেষ্ট ব্যবধান দেখা যায়।

সময়ের হিসাবে প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা আদি প্রস্তর যুগই মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী যুগ। বিগত প্রায় দশহাজার বছর বাদ দিলে মানব ইতিহাসের প্রায় সবটুকুই এযুগের অন্তর্ভুক্ত।

কয়েক বছর আগে আদি মানুষের তৈরী প্রায় কুড়ি লক্ষ বছরের পুরানো পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এযুগের মানুষ পাথরের টুকরো কিম্বা গাছের ডাল দিয়ে নানা কাজ করত। একই হাতিয়ার বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হত। হাতলহীন পাথরের কুঠার,



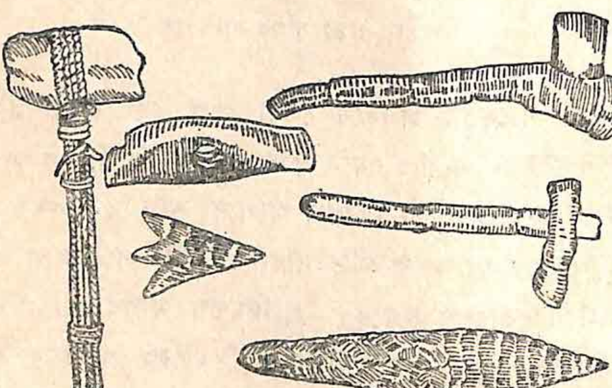
প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

পাথর কিম্বা গাছের ডাল দিয়ে তৈরী গদা এবং লাঠি মানুষের আদিমতম অস্ত্র। এগুলি এমনি কাঁচা হাতের তৈরী যে সাধারণ পাথর বা গাছের ডাল থেকে এদের আলাদা করে চেনা খুবই শক্ত। আমাদের চোখে এগুলিকে অতি সাধারণ জিনিস বলে মনে হলেও এগুলির গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আদিমতম মানুষ যেদিন থেকে কায়িক শ্রম লাঘবের জন্য বিভিন্ন হাতিয়ারের ব্যবহার আরম্ভ করেছিল, সেদিন থেকে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের মৌলিক পার্থক্যের সূচনা হয়। মানুষ হাতিয়ার প্রস্তুতকারী প্রাণী, অন্য কোন প্রাণীর হাতিয়ার বা কাজের সরঞ্জাম তৈরীর ক্ষমতা নেই।

লাঠির মাথায় পাথরের ফলা বেঁধে বর্শা নির্মাণ, ধনুকের ব্যবহার এবং জলপথে ভ্রমণের জন্য ভেলার ব্যবহার, দীর্ঘকালব্যাপী আদি প্রস্তর যুগের অন্তিমকালের ঘটনা। জীবজন্তুর হাড়, শিং, দাঁত বা পাথর দিয়ে শক্ত জিনিষ ছিদ্র করার জন্য বেধনযন্ত্র, হাড়ের সূঁচ এবং হার্পুণ ইত্যাদি নির্মাণের দক্ষতা ধীরে ধীরে আদি

মানুষের আয়ত্তে আসে। পাথর এবং হাড়ের যন্ত্রপাতিতে, গুহাগাত্রে এ যুগের শিল্পীদের সহজাত সৌন্দর্যবোধের নমুনা আজও আমাদের বিস্মিত করে। আদি প্রস্তর যুগের অন্তিমকাল 'মধ্য প্রস্তর যুগ' নামে পরিচিত। এর পরেই নবপ্রস্তর যুগের সূচনা হয়।

নবপ্রস্তর যুগ : যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ও উন্নতি (৮০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে) : এ যুগে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতি পূর্বাপেক্ষা দ্রুততর হয় এবং বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পায়। এ যুগেও যন্ত্র নির্মাণের প্রধান উপাদান হল পাথর, তবে নির্মাণকৌশল এখন অনেক উন্নত। এ যুগের মানুষ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহারেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। কাঠের হাতলওয়ালা কুঠার এবং কাস্তের ব্যবহার এ যুগের ঘটনা। যুদ্ধাস্ত্রের



নব প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

মধ্যে তীর ও বর্শাফলকগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ; ফলে শিকারলাভের নিশ্চয়তাও অনেক বেড়েছিল। যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই মৌলিক পরিবর্তনের কালকে 'নব প্রস্তর যুগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কৃষির সূচনা—মানুষ এখন খাদ্য উৎপাদক : এ যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল কৃষিকাজের সূচনা। মনে হয় মেয়েরাই বীজ বপন

করে শস্য উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। স্বভাবতই পশু-শিকারের মুখ্য দায়িত্ব ছিল পুরুষদের এবং মেয়েরা উদ্ভিদ জগৎ থেকে খাদ্যসংগ্রহে লিপ্ত থাকত। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফলে মেয়েরাই বোধহয় বুঝেছিল কোন্ ঘাসের দানা পুষ্টিকর এবং ক্ষুধানিবারক। বীজ থেকে আবার গাছ জন্মানোর ব্যাপারটি লক্ষ্য করার যথেষ্ট অবকাশ মেয়েদেরই ছিল। কৃষিকাজের সূচনার ফলে মানুষ আর শুধুমাত্র খাদ্য-সংগ্রাহক নয়, সে এখন খাদ্য-উৎপাদকও। প্রকৃতির দানের ওপর নির্ভরশীলতাকে যথাসম্ভব ত্যাগ ক'রে প্রকৃতির দানকে নতুন নতুন উৎপাদনের কাজে প্রয়োগের প্রয়াসে মানুষ এখন যথেষ্ট সফল।

অনেকের মতে উত্তর আফ্রিকা, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান ইরাক), পারস্য (ইরান) এবং ভারতে সর্বপ্রথম কৃষিকাজ শুরু হয়। গম এবং বার্লি মানুষের উৎপাদিত প্রথম ফসল।

নব প্রস্তর যুগে বিবিধ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন

পশুপালন : খুব সম্ভবত প্রায় একই সময়ে মানুষ কৃষি ও পশুপালনের কাজ আরম্ভ করেছিল। শিকারের সময় মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেত এবং শিকারের সন্ধানে কুকুরের ব্যবহার শিখেছিল। কিন্তু যতদিন মানুষ খাদ্যের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল, ততদিন পশুপালন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষিকাজ শিখে মানুষ খাদ্যের ব্যাপারে কিছুটা স্বয়ম্ভর হল, তাই পশুপালনের সুবিধাও তারা পেল। মানুষ প্রথমে কুকুর, ভেড়া, ছাগল, গরু, মোষ প্রভৃতি জন্তুকে পোষ মানায় এবং কালক্রমে গাধা ও ঘোড়াকে পোষ মানাতে শেখে।

মৃৎশিল্প—চাকার আবিষ্কার : কৃষিকর্মের আরেকটি ফল হল মৃৎশিল্পের সূচনা ও দ্রুত উন্নতি। ভবিষ্যতের জন্য ফসল ও কৃষিবীজ মজুত করার তাগিদে মানুষ নানারকম মৃৎপাত্রের ব্যবহার শেখে।

প্রথমে তারা কচি ডাল, বাকল বা শক্ত লতাগুল্ম দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করত। কাঠে গর্ত করে কিম্বা ফলের শক্ত খোলাকেও পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। তরল জিনিষ রাখার জন্য বিভিন্ন পাত্রে মাটির প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হত। পরে আগুনে পুড়িয়ে মৃৎপাত্রগুলিকে কঠিন পদার্থে পরিণত করার কৌশল মানুষ আয়ত্ত করে। এখন থেকে তরল জিনিষকে গরম করার এবং খাদ্যবস্তু রান্না করার কোন সমস্যাই আর রইল না। অনেকের মতে কৃষির মতই মৃৎশিল্পের সূচনা মেয়েরাই করেছিল। চাকার আবিষ্কারের ফলে কুমোরের চাক দিয়ে খুব অল্প সময়ে অনেক বেশী পরিমাণে নানা ধরণের মৃৎপাত্র তৈরী করা সম্ভব হল।

বয়নবিদ্যা ঃ বয়নবিদ্যার প্রচলন এ যুগের শেষ দিকের ঘটনা। এটিও খুব সম্ভব মেয়েদের অবদান। এতদিন মানুষকে জন্তুর চামড়া, গাছের ছাল, পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী পোশাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কৃষি ও পশুপালন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হলে তিসি, তুলো কিম্বা পশুর লোম দিয়ে মানুষ কাপড় তৈরী করতে শিখল। সুতো কাটা এবং কাপড় বোনার জন্য যন্ত্রপাতি প্রাচীন বসতির ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গেছে। মিশর ও পশ্চিম এশিয়াতে সূতীবস্ত্র ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন মেলে।

বাসস্থান ঃ—কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে যাযাবরবৃত্তি সম্ভব নয়। কৃষির প্রয়োজনে মানুষ এখন নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করল। কারণ বীজবোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত জমির উপযুক্ত পরিচর্যা দরকার। কাঠের খুঁটি, সরু ডালপালার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরী দেওয়াল, খড়, তালপাতা ইত্যাদির ছাউনি, এগুলি ছিল বাড়ী তৈরীর উপকরণ। পাথুরে অঞ্চলে পাথরের বাড়ী তৈরী হত। ক্ষেতের ধারে ধারে কয়েকটি বাড়ী নিয়ে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠত। কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত একটি গোষ্ঠী বা দলের মানুষরা হল গ্রামের বাসিন্দা। হিংস্র প্রাণী বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গ্রামের চারপাশে গভীর

পরিখা থাকত। অনেক সময়ে গ্রামের চারিদিকে গাছের মোটা মোটা ডাল দিয়ে অথবা পাথর দিয়ে প্রাচীর তৈরী করা হত।

আদি যানবাহন: চাকার আবিষ্কার হলেও এ যুগে চাকার গাড়ীর কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে ভেলা ছাড়াও ডিঙ্গি নৌকার ব্যবহার জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাকে একটু উন্নত করেছিল। ভারী পণ্যদ্রব্য বহনের জন্য মেসোপোটেমিয়া ও মিশরে গাধার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল।

সমাজজীবনের সূচনা: নবপ্রস্তর যুগের নানা আবিষ্কারের ফলে জীবন পূর্বাপেক্ষা সহজ হয়েছিল, লোকসংখ্যাও বেড়েছিল, মানুষ এখন নানা শিল্পকর্মে ব্যস্ত। তাই এক একটি গোষ্ঠীর নানা মানুষের কাজের মধ্যে ঐক্যসূত্র গড়ে তোলার জন্য নিশ্চয়ই কিছু নির্দিষ্ট রীতি-নীতি গড়ে উঠেছিল। প্রথমে হয়তো গোষ্ঠীর সব মানুষ মিলিতভাবে নিয়মকানুন ঠিক করত। পরে হয়তো কোন প্রবীণতম জ্ঞানী ব্যক্তিকে বা কোন সাহসী যোদ্ধাকে নেতৃপদে নির্বাচনের নিয়ম চালু হয়। এ যুগের জনবসতির কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয় যে এগুলি নিশ্চয়ই কোন দলের সব মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। নিশ্চয়ই কোন সমাজ-সংগঠক বা শাসক গোষ্ঠীর মানুষদের পরিচালিত করেছিল। দলের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ধনী-নির্ধন, শাসক-শোষিতের ভেদাভেদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

ধর্মমত ও শিল্প: মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে সমাধিস্থ করার মধ্যে সেযুগের ধর্মবিশ্বাসের কিছু পরিচয় মেলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখা হত। লোকেরা হয়ত বিশ্বাস করত যে মাটিতে শায়িত পূর্বপুরুষরা শস্য উৎপাদনে সাহায্য করে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মানুষ বিশেষ কোন প্রাণীকে তাদের পূর্বপুরুষজ্ঞানে পরম শ্রদ্ধা করত। পূজ্য প্রাণীগুলিকে আধুনিক পণ্ডিতরা 'টোটেম' নাম দিয়েছেন। গোষ্ঠীর কোন লোক তার পূজ্য টোটেমের ক্ষতি করত না।

এ যুগের শিল্পে জন্তু-জানোয়ারের চিত্র পূর্বাপেক্ষা কম। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত শিল্পনিদর্শনের মধ্যে নারীমূর্তির সংখ্যাই বেশী। আমাদের দেশে গোদাবরী নদীর দক্ষিণে মৃণ্ময়ী নারীমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সমাধিস্তম্ভ এবং মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে বৃহদাকার পাথরের ব্যবহার এ যুগের স্থাপত্যশিল্পের অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। ইংল্যাণ্ডের 'ষ্টোনহেন্‌জ' তৎকালীন স্থাপত্য-বিদ্যার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভাষার প্রচলনঃ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের বাহন হল ভাষা। মৌখিক ভাষার প্রচলনের সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শিকার এবং যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন সঙ্কেত ও গলার নানা আওয়াজ, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা মনে রাখা এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদির প্রয়োজনেই ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। একই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শব্দ বা সঙ্কেত বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত। এইভাবে মৌখিক ভাষার প্রচলন শুরু হয়। আজ থেকে আনুমানিক মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ লিখিত ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করে।

উর্বরা পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে বন্দনাঃ প্রাচীনকালের মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সম্পর্কে কিছুই জানত না। নব প্রস্তর যুগের কৃষিজীবী মানুষ উর্বরা পৃথিবীকে মাতৃদেবী-রূপে বন্দনা করত। মা যেমন সন্তানের জন্ম দেন, তেমনি উর্বর ভূমিও ফসল দেয়। হয়তো এই ব্যাপার লক্ষ্য করে সেযুগের মানুষের মনে উর্বরতার দেবী সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল। নবপ্রস্তর যুগের দেবমূর্তির মধ্যে মাতৃমূর্তির সংখ্যাই বেশী।

অনুশীলনী

ক। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ১। আদি প্রস্তর যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবন-যাত্রা সম্পর্কে কি জান? ২। নব প্রস্তর যুগের মানুষদের জীবনযাত্রার মূল ধারাগুলি আলোচনা কর। ৩। কৃষিকাজের সূচনার ফলে মানবজীবনে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

খ। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ** ১। মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে কি জান? ২। আদিম মানুষরা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করত না কেন? ৩। কবে এবং কোথায় মানুষ প্রথম আগুনের ব্যবহার করেছিল? আগুনের ব্যবহার শেখার ফলে মানুষের কি কি সুবিধা হয়েছিল? ৪। মানুষের প্রাচীন ইতিহাসকে কটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? কিসের ভিত্তিতে এই ভাগগুলি করা হয়েছে? ৫। কোন্ সময় মানুষ প্রথম হাতিয়ার ব্যবহার করতে আরম্ভ করে? ঐ সময় হাতিয়ার তৈরীর মূল উপাদান কি ছিল? ৬। প্রাচীন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কি জান? ৭। কোন্ সময় থেকে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের মৌলিক পার্থক্যের সূচনা হয়েছিল? ৮। 'নব প্রস্তর যুগ' কাকে বলে? ৯। কোন্ সময় মানুষ পশুপালন করতে শেখে? ১০। মৃৎশিল্পের সূচনা সম্পর্কে কি জান? চাকার আবিষ্কারের ফলে মৃৎশিল্পের কি সুবিধা হয়েছিল? ১১। কোন্ যুগে বয়নবিদ্যার প্রচলন হয়? ১২। কোন্ যুগে মানুষ নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে? মানুষের স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ১৩। মানুষের প্রথম স্থায়ী বাসস্থানের কোন বর্ণনা দিতে পার কি? ১৪। মানুষের প্রথম সমাজজীবন সম্পর্কে কি জান? ১৫। 'টোটেম' কাকে বলে? ১৬। নব প্রস্তর যুগের শিল্প সম্পর্কে কি জান? ১৭। কিভাবে মৌখিক ভাষার প্রচলন হয়? কবে থেকে লিখিত ভাষার প্রচলন হয়? ১৮। নব প্রস্তর যুগে পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে কল্পনা করা হত কেন? ১৯। কোন্ যুগে মেয়েরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জিনিস আবিষ্কার করেছিল? মেয়েদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের বিবরণ দাও।

গ। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** ১। সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :— (অ) —— প্রথম খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে। (লৌহ যুগের মানুষ, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ, নব প্রস্তর যুগের মানুষ, প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ)। (আ) মাত্র —— বছর পূর্বে আদি মানুষ বর্তমান মানুষের আকৃতি লাভ করে। (ত্রিশ-চল্লিশ হাজার, পাঁচ হাজার, একশ, কুড়ি লক্ষ)। (ই) সম্ভবত —— বছর পূর্বে 'পিকিং মানুষ' আগুনের ব্যবহার শেখে। (সাত লক্ষ,

দশ হাজার, দুই থেকে পাঁচ লক্ষ)। (ঈ) বিগত প্রায় দশ হাজার বছর বাদ দিলে মানব ইতিহাসের প্রায় সবটুকুই —— অন্তর্ভুক্ত। (নব প্রস্তর যুগের, লৌহ যুগের, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের, প্রাচীন প্রস্তর যুগের)। (উ) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ —— ও —— করতে শেখে নি। (জীবনধারণ, শস্য রোপণ, বস্ত্রবয়ন, খাদ্য সংগ্রহ, যুদ্ধ)। (ঊ) মানুষ যেদিন থেকে —— ব্যবহার আরম্ভ করেছিল, সেদিন থেকে অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের —— পার্থক্যের সূচনা হয়। (স্বাভাবিক, যন্ত্রপাতির, মৌলিক, অস্ত্রের, বাতাসের, চাকার, জলের, সূক্ষ্ম)। (ঋ) নব প্রস্তর যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ——। (আগুনের আবিষ্কার, কৃষিকাজের সূচনা, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার)।

২। ঘটনাগুলি কোন যুগের? (ক) আগুনের আবিষ্কার (খ) হাতলহীন পাথরের কুঠারের ব্যবহার (গ) গম ও বার্লির চাষ (ঘ) কুমোরের চাকে মৃৎপাত্র নির্মাণ (ঙ) মানুষের স্থায়ী বসতিস্থাপন (চ) ডিঙি নৌকার প্রচলন (ছ) সমাজজীবনের সূচনা (জ) পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে বন্দনা।

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ প্রথমে তামা ও তার কিছু পরে তামা ও টিনের সংযোগে উৎপন্ন ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার করতে সুরু করে। তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহারের যুগকে 'তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ' বলা হয়। প্রথমে মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) ও কালক্রমে মিশর, ভারত ও চীনে এই দুই ধাতুর প্রচলন হয়। নব প্রস্তর যুগে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতির ফলেই মানুষ ধাতুর ব্যবহার করতে পেরেছিল। কারণ, ধাতুর কাজ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই জটিল। ধাতুর তৈরী জিনিসপত্রের সঙ্গে ধাতু সংগ্রহ, ধাতু নিষ্কাশন, গলানো, ঢালাই ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল কর্মপদ্ধতি জড়িত। কৃষি ও শিকারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত থাকা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। ধাতু সংগ্রহ ও সেই সংগৃহীত ধাতু থেকে জিনিসপত্র তৈরী করতে হলে বিভিন্ন পর্বে বহু দক্ষ শ্রমিকের সম্মিলিত শ্রমের প্রয়োজন। ধাতুশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব সমাজের অন্যান্যদের বহন করতে হবে। যতদিন প্রত্যেক মানুষকে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল ততদিন ধাতুশিল্পের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কৃষিকর্মের এমনি উন্নতি হয়েছিল যে বেশ কিছু লোক খাদ্য উৎপাদনে লিপ্ত না থেকে ধাতুশিল্পে পারদর্শী হবার সময় ও সুযোগ পেয়েছিল। এইভাবে পৃথিবীতে ধাতুর যুগের সূচনা হয়।

শহরের সূচনা—দক্ষ শ্রমিক ও বাণিজ্যের উদ্ভব

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল শহরের সূত্রপাত।

শহরের মানুষের সঙ্গে কৃষিকর্মের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। মানুষের আর্থিক জীবনে কতগুলি বড় পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে শহর গড়ে উঠেছিল।

কিভাবে, কাদের নিয়ে শহরের সূচনা? মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের বিভিন্ন নদী উপত্যকার উর্বর ভূমিতে সেখানকার চাষীরা কালক্রমে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পরিমাণ শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই বাড়তি ফসলে এমন কিছু লোকের অন্নসংস্থান হল, যারা কৃষিকাজ ছেড়ে বিভিন্ন কারিগরীবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের সময় ও সুযোগ পেয়েছিল। কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকতে হয়নি বলে এ যুগে তাঁতী, কুমোর, ছুতোর ও ধাতুশিল্পীরা বিশেষ বিশেষ কর্মে নিযুক্ত দক্ষ কারিগরে পরিণত হয়েছিল। জিনিস তৈরীর জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য বাজারের সন্ধানে কারিগরদের অনেকেই একত্রে বসবাস করত। কারিগরদের এই বসতিগুলিই ধীরে ধীরে শহরের রূপ নিল। লোকসংখ্যা ও বাড়ীঘরের চেহারাতে এই নতুন শহরগুলির সঙ্গে বড় গ্রামের কোন তফাৎ ছিল না। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে শহরের মস্ত তফাৎ এই যে, শহুরে মানুষ গ্রামের মানুষের মত চাষাবাদে লিপ্ত নয়। গ্রামের চাষী শহরের মানুষের অন্ন যোগায়। ফসলের বিনিময়ে চাষীরা পায় শহরের কারিগরদের তৈরী নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

বাণিজ্য (বিনিময় প্রথা): আজকাল আমরা দোকানীর কাছ থেকে জিনিষ কিনে তাকে টাকা দিই। জিনিসের মূল্যমান ঠিক করার জন্যই আমরা টাকা ব্যবহার করি। কিন্তু তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ জিনিসের বিনিময়ে জিনিস দেওয়া-নেওয়া করত। যেমন, কোন চাষীর একটি কাস্তের দরকার, কোন কামারের দরকার কিছু শস্য। চাষী তার কিছু পরিমাণ শস্যের বদলে কামারের কাস্তেটি কিনল। এইভাবে উভয়ের প্রয়োজন মিটল। পরবর্তীকালে 'লৌহ যুগে' জনসংখ্যা ও পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে

এবং দূরদূরান্তের মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলে মুদ্রার সাহায্যে সহজ লেনদেন সুরু হয়। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের মানুষ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র তৈরী করতে পেরেছিল বলেই এ যুগে বাণিজ্য ও বাজারের সূত্রপাত হয়।

সমাজে শ্রেণীভেদ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই ও রাষ্ট্রের সূচনা : তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ ও শিল্পকর্মে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল। এই উন্নতির সূত্রেই ঐসব অঞ্চলে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়। প্রথমত, কৃষিকর্মে উন্নতির ফলে গোষ্ঠীর মানুষ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন করতে পেরেছিল। এই উদ্বৃত্ত ফসল আত্মসাৎ করে গোষ্ঠীর দলপতি ও তার অনুচররা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হল। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হলে সম্পত্তিবৃদ্ধি উৎপাদনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াল। যেহেতু কৃষিকর্ম ভূমিনির্ভর, সেহেতু ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার বৃদ্ধির লড়াই শুরু হয়। ভূমির উপর ব্যক্তিমালিকানা স্থাপিত হলে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক ভূস্বামী, এবং অধিকাংশ মানুষ সাধারণ চাষীতে পরিণত হল। দ্বিতীয়ত, তামা ও ব্রোঞ্জের মত দামী ধাতুর ব্যবহারও গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করে। ধাতু দুর্লভ বস্তু। ধাতু দিয়ে তৈরী জিনিষগুলি পাথরের উপকরণের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। গোষ্ঠীর দলপতি, প্রবীণ ব্যক্তি, পুরোহিত কিম্বা সাহসী যোদ্ধারা ধাতু সংগ্রহ ও ধাতু দিয়ে তৈরী জিনিসের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। কারিগরদের শ্রমের ফসল এরাই আত্মসাৎ করল। এইভাবে মানব-সমাজে ধনী-নির্ধন, ক্ষমতাভোগী-ক্ষমতাহীন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।

উৎপাদনের উপায় উন্নত হলেও কোন গোষ্ঠীর পক্ষেই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই অভাব দূর করার জন্য অনেকেই যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের আশ্রয় নিত। ধাতুনির্মিত উন্নত অস্ত্রাদির প্রচলনও মানুষের যুদ্ধের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। অনেক সময় কোন কোন আদিম গোষ্ঠীর মানুষ প্রতিবেশী কোন উন্নত অঞ্চলের সম্পদ লুণ্ঠনের চেষ্টা করত। এইভাবে যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন নদী উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও উপযুক্ত সেচব্যবস্থা

গড়ে তোলার প্রয়োজনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। নিশ্চয়ই কোন রাষ্ট্রশক্তি বা শাসকের অধীনে তারা এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছিল। এইভাবে সমাজের কল্যাণার্থে, মানুষের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সূচনা হয়। উৎপাদনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে জটিলতা যতই বৃদ্ধি পেল, রাষ্ট্রের ক্ষমতাও সেই হারে বৃদ্ধি পায়। এককালে যে রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণকর প্রয়াসে সাহায্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সেই রাষ্ট্রই সমাজের অল্পসংখ্যক মানুষের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়।

বিভিন্ন নদী উপত্যকায় সভ্যতাবিকাশের কারণঃ যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে মেসোপোটেমিয়ার টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী, মিশরের নীল নদী, ভারতের সিন্ধু নদী এবং চীনের হোয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপত্যকাঅঞ্চলগুলি সভ্যতার মহান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

এইসব নদীতীরে সভ্যতা বিকাশের একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, বার্ষিক বন্যায় এইসব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পলি সঞ্চিত হত। পলিসমৃদ্ধ উর্বরভূমিতে কৃষকরা অনায়াসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর ফসল উৎপন্ন করত। অন্নচিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এখানকার মানুষ জীবনের নানাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছিল। দ্বিতীয়ত, বাঁধ দিয়ে বন্যার জল প্রতিরোধ করা এবং সেই জলে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছিল। অসংখ্য মানুষের ঐক্যবদ্ধ ও কঠোর প্রয়াসকে উপযুক্তভাবে পরিচালনার জন্য ধীরে ধীরে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থাও গঠিত হয়েছিল। এইসব অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলির সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, প্রাচীনকালে জলপথই ছিল যাতায়াত ও বাণিজ্যের সহজতম উপায়। টাইগ্রিস্, ইউফ্রেটিস্, নীল, সিন্ধু, হোয়াং হো এবং ইয়াং সিকিয়াং নদীগুলির অধিকাংশ খুব নাব্য ছিল। ফলে ঐসব অঞ্চলের মানুষ বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নতিলাভ করে। উৎপাদন ও বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে শহর ও লিখিত ভাষার সূচনা হয়। এইভাবে সভ্যতার মূল চিহ্নগুলি—রাষ্ট্র ও আইনব্যবস্থা, শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা, ধর্ম ও দর্শনচিন্তা, শহর এবং লিপি, ঐসব অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অনুশীলনী

ক। **রচনাধর্মী প্রশ্ন**: ১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা সম্পর্কে কি জান? ২। সভ্যতার আদি কেন্দ্রগুলির নদীকূলে অবস্থিত হবার কারণগুলি আলোচনা কর। ৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান? ৪। শহরের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছিল?

খ। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**: ১। সভ্যতার মূল চিহ্নগুলি কি? ২। সভ্যতার আদি কেন্দ্রগুলির নাম কর। এগুলি কোথায় অবস্থিত ছিল? ৩। কিভাবে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়? ৪। 'বিনিময় প্রথা' কাকে বলে? মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল কেন? ৫। প্রধানত কোন্ শ্রেণীর মানুষ শহরের সূচনা করেছিল? ৬। কোন্ সময় সমাজে শ্রেণীভেদের আবির্ভাব হয়? ৭। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের রাষ্ট্র সম্পর্কে কি জান? ৮। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে যুদ্ধের কারণগুলি কি?

গ। **বিষয়মুখী প্রশ্ন**: ১। সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর:— (ক) তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহারের যুগকে —— বলে। (প্রাচীন প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ)। (খ) আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে —— যুগের সূচনা হয়। (লৌহ, প্রস্তর, তাম্র-ব্রোঞ্জ)। (গ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষ —— দেওয়া-নেওয়া করত। (অস্ত্রের বিনিময়ে অস্ত্র, জিনিষের বিনিময়ে জিনিষ)। (ঘ) বাণিজ্যের সূচনায় কেনাবেচার ক্ষেত্রে ——। (মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না)। (ঙ) যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় —— মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনের কিছু অংশ সভ্যতার মহান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। (সাত হাজার বছর পূর্বে, এক হাজার বছর পূর্বে, তিন হাজার বছর পূর্বে)। (চ) মেসোপেটেমিয়ায় ——, মিশরে ——, ভারতে —— ও চীনে —— মানব সভ্যতার আদিকেন্দ্র হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (গঙ্গা ও গোদাবরী নদীর উপত্যকা, ভোল্গা নদীর উপত্যকা, সিন্ধু নদীর উপত্যকা, নীল নদীর উপত্যকা, টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর উপত্যকা, হোয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপত্যকা)।

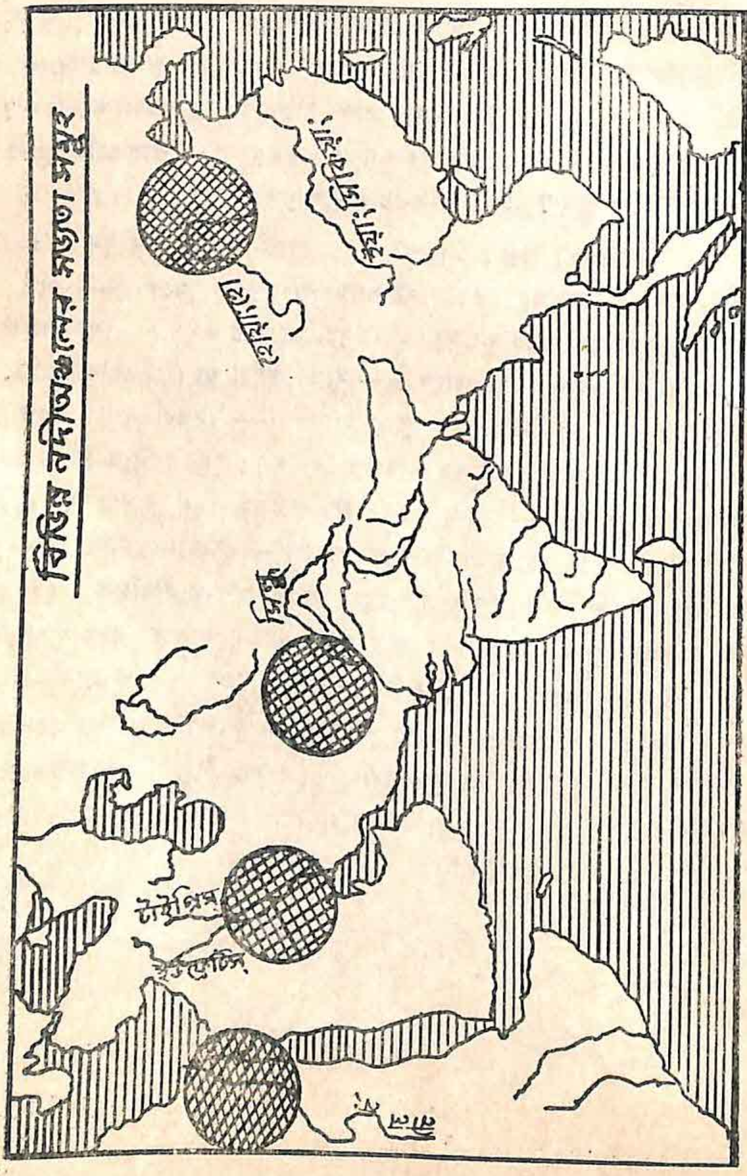
চতুর্থ অধ্যায়

সভ্যতার আদি কেন্দ্রগুলি

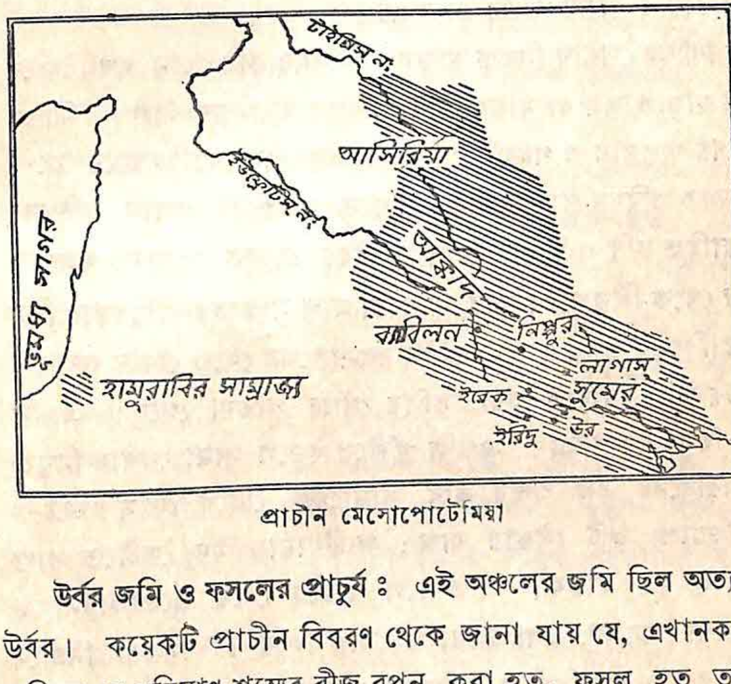
(আ. খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল)

(ক) মেসোপোটেমিয়া

ভৌগোলিক অবস্থান, সভ্যতার আদিকেন্দ্র ঃ মেসোপোটেমিয়ার



(বর্তমান ইরাক) মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী। 'মেসোপোটেমিয়া' কথাটির অর্থ হল 'দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল'। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশের নিম্নভূমিকে বলা হত সুমের। সুমেরের উত্তর-পূর্বে ছিল ব্যাবিলন ও আক্কাদ। উত্তরের উচ্চভূমি আসিরিয়া নামে পরিচিত ছিল। সুমের অঞ্চলে যীশুর জন্মের তিন হাজার বছরেরও পূর্বে এক উন্নত সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র হল সুমের।



প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া

উর্বর জমি ও ফসলের প্রাচুর্য ঃ এই অঞ্চলের জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। কয়েকটি প্রাচীন বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এখানকার জমিতে যে পরিমাণ শস্যের বীজ বপন করা হত, ফসল হত তার ছিয়াশি গুণেরও বেশী। খেজুর গাছও জন্মাত প্রচুর। এই অনুকূল পরিবেশের সদ্ব্যবহার করে সুমেরীয়রা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যসংগ্রহে সমর্থ হয়েছিল। অন্নচিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে এখানকার অধিবাসীরা এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করে।

বন্যা প্রতিরোধের বন্দোবস্ত ঃ টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর বাধক বন্যাকে কৃষির অনুকূলে আনার জন্য সুমেরীয়দের বিশেষ

পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই অগভীর নদীগুলির বন্যার প্রকোপের হাত থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা উপযুক্ত বাঁধ নির্মাণ করেছিল। খাল কেটে বন্যার জলকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত করে উন্নত সেচব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছিল। ফলে অনেক অহল্যা-ভূমিও শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। বন্যার জলকে কৃষিকর্মে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মানুষের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে এখানে ঘন জনবসতির সৃষ্টি হয়। নদীশাসন ও উন্নত সেচব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণীর উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ ঃ সুমের কৃষিপ্রধান দেশ। তবে কৃষি ছাড়াও অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিল। বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কার ও পাত্রনির্মাণ এবং বস্ত্রবয়নে কারিগরদের যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক শহরের প্রধান মন্দিরের পুরোহিত কৃষি ও শিল্পকর্মের সমস্ত বিষয় তদারক করতেন। ফসলের বীজ থেকে শিল্পকর্মের সবরকম কাঁচা মাল সংগ্রহের দায়িত্বভার ছিল পুরোহিতের উপর। শহরগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে রোদে শুকানো ইটের উপর খোদাই করা লিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। এগুলি হল হিসাবের খাতা। এগুলি খুঁটিয়ে পড়লে নানা পেশায় নিযুক্ত সুমেরীয়দের এক সুন্দর ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে— রুটিওয়ালা রুটি সেঁকায় ব্যস্ত; ভাটিখানায় মদ তৈরীতে ব্যস্ত রয়েছে বহু মানুষ; তাঁতশালে রয়েছে মেয়ে সুতোকাটুনী ও তাঁতীরা; সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে বিলাসদ্রব্য নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছে দক্ষ শিল্পীরা; হিসাব ও দলিল রচনায় নিমগ্ন লিপি-কাররা; দাসের দল শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত; এই সমস্ত কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন ও পরিচালনা করছেন মন্দিরের মাননীয় পুরোহিত।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুমেরবাসীদের অবদান

গৃহ ও মন্দির নির্মাণঃ মানবসভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুমেরীয়দের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। শহর, বাসগৃহ

ও মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সুমেরীয়রা অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল। ইরেক্, ইরিহু, লাগাস্ এবং উর শহরের চারদিকে ছিল ইটের দেওয়াল ও পরিখা। রোদে শুকানো মাটির ইট দিয়ে মন্দির ও গৃহাদি নির্মিত হত। মন্দিরগাত্র অনেক সময় বিদেশ থেকে আমদানী করা বহুমূল্য কাঠে তৈরী হত। প্রত্যেকটি শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকত একটি মন্দির। কৃত্রিম উপায়ে গঠিত সুউচ্চ ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত বহুতলবিশিষ্ট মন্দিরটি শহরের যে কোন জায়গা থেকেই দেখা যেত। উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত মন্দিরগাত্র এবং বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত উচ্চভূমিতে সযত্নে লালিত উদ্যানগুলি এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করত।

দেওয়াল চিত্র ঃ পলিমাটির দেশ সুমের। এখানে পাথর দুষ্প্রাপ্য। পাথর বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত। তাই মিশরীয় ভাস্করদের মত ব্যাপকভাবে পাথরের উপর শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের বিশেষ কোন সুযোগ সুমেরীয়দের ছিল না। রোদে শুকানো ইটে তৈরী মন্দিরগাত্রে খোদিত সূক্ষ্ম কারুকার্য ও পুরুষ এবং নারী মূর্তিগুলি উন্নত শিল্পমানের পরিচয় দেয়।

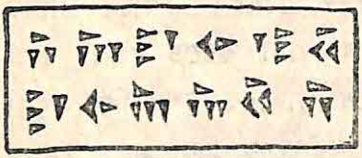
পাথর খোদাই ঃ ছোট ছোট পাথরের চাক্‌তিতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য সুমেরীয় শিল্পপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এগুলি শিল্পীদের অসামান্য ধৈর্য এবং দীর্ঘদিনের অনুশীলনে অর্জিত দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

ধাতুবিদ্যা ঃ উর শহরে প্রাচীন সুমেরীয় রাজবংশের সমাধি-গুলিতে নানাধরণের ধাতুনির্মিত অলঙ্কার, পানপাত্র, বাদ্যযন্ত্র ও অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুমেরীয়রা যে ধাতুবিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত ছিল, এগুলি তার প্রমাণ।

যানবাহন ও বাণিজ্য ঃ শস্যশ্যামল সুমেরে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য থাকলেও খনিজ পদার্থের যথেষ্ট অভাব ছিল। গৃহাদি নির্মাণের জন্য মূল্যবান কাঠও এখানে পাওয়া যেত না। তাই কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্পকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত। সেযুগে জলপথই ছিল যাতায়াতের সহজতম উপায়। টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী এবং নৌচালনার উপযোগী সেচখালগুলি দিয়ে সুমেরীয়রা অতি সহজেই বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সুমেরের লোকরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চাকার গাড়ী ব্যবহার করে যাতায়াত ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমে বোঝা যায় যে সিন্ধুসভ্যতার লোকদের সঙ্গে সুমেরীয়দের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

লিপির উদ্ভব ঃ লিখিত ভাষার প্রচলনের ক্ষেত্রেও সুমেরীয়রা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সুমেরে ব্যবহৃত 'কিউনিফর্ম' লিপি পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপিগুলির অন্যতম। নরম মাটির চাক্তির উপর সরু কাঠি দিয়ে দাগ কেটে লিখলে অক্ষরগুলি অনেকটা কীলকের মত দেখায় বলে খ্যাতনামা লিপিবিদ্ টমাস হাইড সুমেরীয় লিপির নাম রেখেছেন 'কিউনিফর্ম লিপি'। ল্যাটিন শব্দ Cuneus (ইংরেজী 'wedge', বাংলায় 'কীলক') ও forma (ইংরেজী 'shape' ও বাংলায় 'আকৃতি') থেকে কথাটির উদ্ভব।

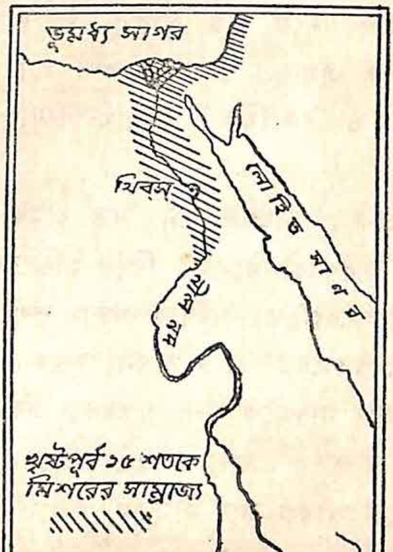


'কিউনিফর্ম' লিপি

(খ) মিশর

ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ নীল নদীর তীরবর্তী অঞ্চল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার জন্মভূমি। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। মিশরে বৃষ্টিপাত কম। কিন্তু নীলনদীর বার্ষিক বন্যায় এক বিস্তীর্ণ পলিসেবিত অঞ্চল চাষের উপযোগী হত। নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে সোনা পাওয়া যেত। গৃহ নির্মাণের উপযোগী পাথরও সহজলভ্য

ছিল। জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। এই প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধাগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য মিশরীয়রা



নীল নদীর উপত্যকা

সুমেরবাসীদের মতই দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মিশরে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ এই পরিশ্রমের সার্থক ফসল।

মিশরীয় সমাজে স্তরভেদ—ফ্যারাও, পুরোহিত শ্রেণী, লিপি ও লিপিকার, করসংগ্রাহক এবং সৈন্যদল (শ্রমিক) ঃ

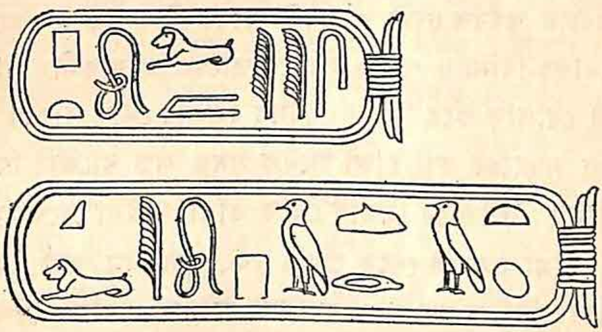
ফ্যারাও ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। মিশরের রাজার উপাধি ছিল ফ্যারাও। মিশরীয়রা ফ্যারাওকে দেবতার মত পবিত্র বলে মনে করত। ফ্যারাও কথাটির অর্থ হল 'বৃহৎ অট্টালিকা' বা 'মন্দির' যেখানে এই পবিত্র দেবতা অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ফ্যারাও ছিলেন গোটা মিশরের

মালিক। নীলনদীর বন্যা আটকানো থেকে শুরু করে উৎপন্ন ফসল বণ্টনের সবরকম দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন শাসক শ্রেণীর মুখপাত্র। রাজা, অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীকে নিয়ে এই শাসকশ্রেণী গঠিত হয়েছিল। রাজার মহিমা ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা প্রচার করে এরা সমস্ত ক্ষমতা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলি আত্মসাৎ করেছিল।

পুরোহিত-শ্রেণী ঃ রাজ্যশাসনের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও রাজা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মন্দিরের পুরোহিতদের নিযুক্ত করতেন। পুরোহিতরা সর্বদাই রাজার সুখ, সমৃদ্ধি ও অক্ষয় পরমায়ুর জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করত। রাজাকে মেনে চলার জন্য সাধারণ মানুষকে উপদেশ দেওয়া হত। পুরোহিতরা প্রচার করত যে রাজভক্ত প্রজার উপর দেবতাদের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। রাজা থেকে আরম্ভ করে দীনতম প্রজার দানে পুষ্ট হয়ে পুরোহিতরা কালক্রমে বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিল। নিজেদের সম্পর্কে এরা নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করত। দেবতারা নাকি পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলেন, তাই পুরোহিতদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করলে ভক্তরা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করবে। উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যই পুরোহিতরা এইসব কথা বলত। কাল-ক্রমে পুরোহিতদের পদগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে এবং তারা রাজার কাজে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।

লিপি ও লিপিকার ঃ মেসোপোটেমিয়ার লিপির মত মিশরের লিপিও বেশ প্রাচীন। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে এই লিপির সূত্রপাত হয়। মিশরের এই প্রাচীন লিপিকে 'হায়রোগ্লিফিক্' ('পবিত্র-লিপি' বা 'দেবভাষা') বলা হয়। পবিত্র ফ্যারাওদের রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য এই লিপির উদ্ভব হয়েছিল। লিখিত ভাষার প্রচলনের ফলে বিত্তশালীদের সম্পত্তির হিসাব রাখা এবং দলিলপত্রাদি রচনা করা সহজ হয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে

লিখিত ভাষার কোন যোগাযোগ ছিল না। লিপিকাররা ছিল প্রধানত উচ্চবংশজাত। বর্ণমালা আয়ত্ত করা শ্রমসাধ্য ও সময়-



'হায়রোগ্লিফিক্' লিপি

সাপেক্ষ ছিল। তাই কালক্রমে লিপিকাররাও বিশেষ ক্ষমতাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল।

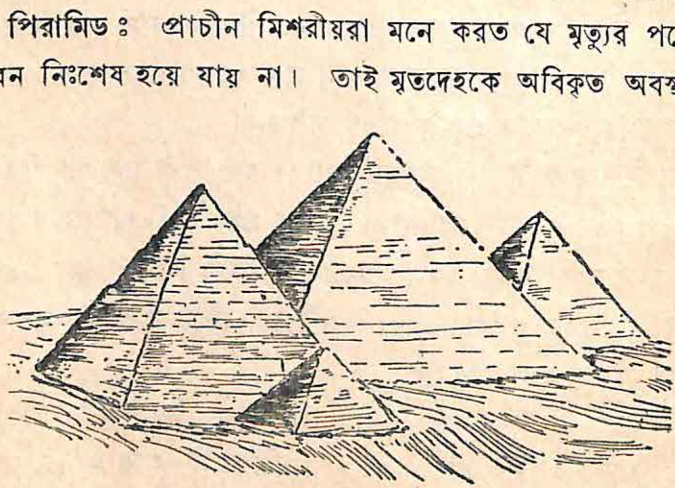
করসংগ্রাহক ঃ করবিভাগের উচ্চপদে একমাত্র অভিজাতরাই নিযুক্ত হত। এরা বহুসংখ্যক কর্মচারীর মাধ্যমে কর আদায় করত। নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করতেও এরা কুণ্ঠাবোধ করত না।

সৈনিক ও শ্রমিক ঃ রাজ্যবিস্তারের জন্য রাজাকে এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করতে হয়েছিল। যুদ্ধের সময় চাষীদের জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করা হত। যুদ্ধরত থাকাকালীন এদের জমি অনাবাদী অবস্থায় থাকত। বিদেশীদের নিয়ে ভাড়াটে সৈন্যদল গঠনের প্রথাও চালু হয়েছিল।

বিভিন্ন শিল্পকর্মে দক্ষ শ্রমিকরা রাজা, অভিজাত কিংবা পুরোহিতদের অধীনে কাজ করত। মালিকরাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করত। উৎপন্ন দ্রব্যগুলি উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ব্যবহার করত। স্বাধীনভাবে শিল্পকর্ম করে জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা খুব অল্প শ্রমিকেরই ছিল।

বাণিজ্য ঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশর সুমের এবং সিন্ধু উপত্যকার মানুষদের মত উন্নতিলাভ করতে পারেনি। মিশরের রাজা, জমিদার ও পুরোহিতরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তাঁদের অধীনে কর্মরত চাষী ও কারিগরদের দিয়ে উৎপন্ন করতেন। সাধারণ মানুষ বিনিময় প্রথার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিষপত্র যোগাড় করে নিত। যেসব জিনিষ দেশে পাওয়া যেত না সেগুলি সংগ্রহের জন্য রাজা অনেক সময় অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। এইভাবে সিনাই থেকে তামা, নুবিয়া থেকে সোনা, আরব ও সোমালিল্যাণ্ড থেকে সুগন্ধি দ্রব্য, মূল্যবান কাঠ, মশলা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাথর আসত। বিজিত দেশগুলি থেকে করের পরিবর্তে এই সব জিনিষপত্র আমদানী করা হত। কখনও কখনও আমদানী দ্রব্যের দাম হিসাবে সোনা কিম্বা ফসল রপ্তানী করা হত। রাজাই সমস্ত বাণিজ্যব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তাই মিশরে বণিকশ্রেণীর প্রায় কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাণিজ্যের সূত্রে মিশরের সংস্কৃতি ভূমধ্যসাগরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পিরামিড ঃ প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করত যে মৃত্যুর পরেও জীবন নিঃশেষ হয়ে যায় না। তাই মৃতদেহকে অবিকৃত অবস্থায়

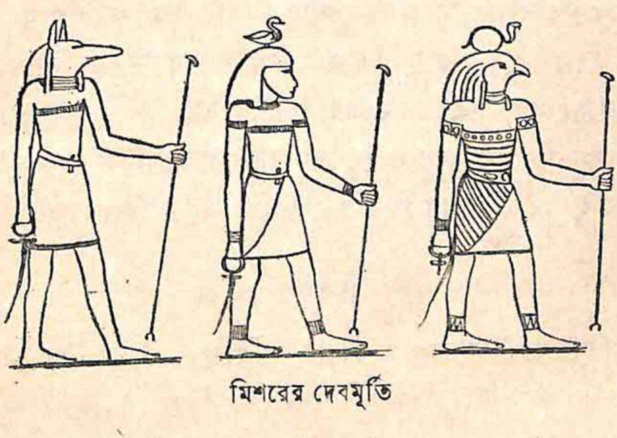


পিরামিড

রাখার চেষ্টা করা হত। এইভাবে সযত্নে রক্ষিত মৃতদেহকে 'মমি' বলে। মৃতদেহকে 'মমি' করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল বলে একমাত্র

উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে মমির বন্দোবস্ত করত। অতি বিত্তশালীরা বহুমূল্যবান মমিগুলিকে উপযুক্তভাবে সমাধিস্থ করার জন্য নিজেদের জীবদ্দশাতেই পিরামিড বা প্রস্তর-নির্মিত সমাধিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করত। এরকম বহু পিরামিডের নিদর্শন আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এগুলির মধ্যে ফ্যারাও খুফু-র জন্য নির্মিত পিরামিডটি বৃহত্তম। এটি নীল-নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ৪৭৫ ফুট উঁচু, ২৪০০ বর্গফুট জুড়ে এর ভিত্তিভূমি। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই সমাধি নির্মাণের এক সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। একসঙ্গে প্রায় এক লক্ষ লোক এই পিরামিড নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। প্রতি তিনমাস অন্তর লোক বদল করা হলেও হাজার হাজার লোক এই কাজে প্রাণ হারায়। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ দাসকে এই কাজের জন্য ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কাজটি শেষ হতে প্রায় ত্রিশ বছর লেগেছিল। দাসদের বেগার শ্রমে গড়ে ওঠা পিরামিডগুলিকে নিষ্ঠুর দাসপ্রথার প্রতীকরূপে গণ্য করাই উচিত বলে মনে হয়।

ধর্মবিশ্বাস ঃ প্রাচীনকালের অন্যান্য দেশের মত মিশরের লোকেরাও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করত।



মিশরের দেবমূর্তি

মাঠের ফসলের পুষ্টির জন্য চাই সূর্যালোক। সূর্যদেবতা হলেন 'রা'। 'রা' হলেন দেবতাদের রাজা। সোনার রথে চড়ে তিনি

পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যান। তাই ভোর হয়, সন্ধ্যা নামে। নীলনদীর বার্ষিক বন্যার ফলেই বৃষ্টিহীন মিশরে কৃষিকাজ সম্ভব হয়েছিল। মিশরীয়রা নীলনদীর উৎপত্তিস্থল কোথায় তা জানত না। বন্যার প্রকৃত কারণ তাদের অজ্ঞাত ছিল। তাই এই নদী সম্পর্কে তাদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল। নীলনদীর দেবতা ওসিরিস্ সূর্যদেব রা-এর মতই পবিত্র।

মিশরীয়রা মনে করত যে মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবন আছে। এই ধারণা থেকেই মৃতদেহকে মমি করে রাখার বন্দোবস্ত হয়েছিল।

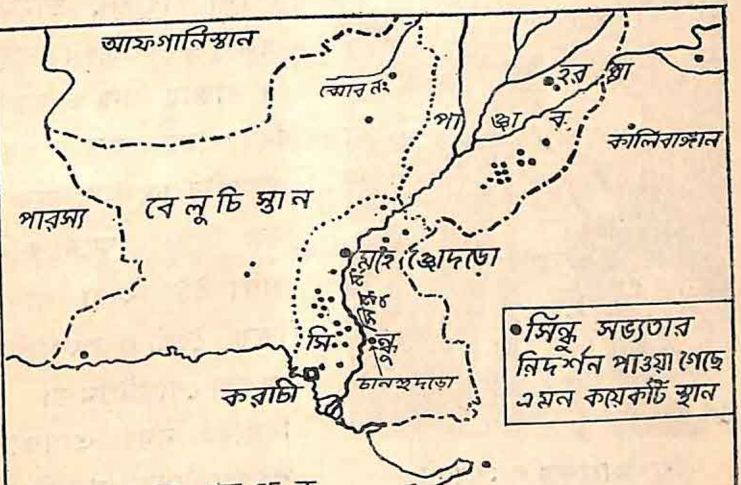
জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়ঃ প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। রাষ্ট্রপরিচালিত সেচব্যবস্থার ফলে প্রচুর পরিমাণ ফসল ও শাক্‌সব্জী উৎপন্ন হত। পশুপালনেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

রাজা, অভিজাত ও পুরোহিতরাই প্রধানত শিল্পদ্রব্যের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ দক্ষ শ্রমিক এঁদের অধীনে কাজ করত। মূল্যবান বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যাপারে মিশরীয় শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। মূল্যবান কাঠ দিয়ে অতি সুন্দর আসবাবপত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মিশরে দক্ষ কারিগরের কোন অভাব ছিল না। কাচ শিল্পেও বহু দক্ষ কারিগর নিযুক্ত ছিল। নানা রঙের কাচ উৎপাদনে এরা বিশেষ দক্ষ ছিল। প্রাচীন যুগে মিশর কাচশিল্পের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বহু শ্রমিক তামা ও মূল্যবান পাথর সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল।

(গ) সিন্ধু উপত্যকা

বিভিন্ন আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ সিন্ধুনদীর তীরবর্তী অঞ্চল ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। বর্তমান শতকের গোড়ায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভ্যতার নিদর্শন প্রথম আবিষ্কার করেন। প্রথমে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে প্রাচীন শহরের

সন্ধান পাওয়া যায়। এই শহর তুটি সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত বলে এই সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, রাজস্থান, গুজরাট এবং উত্তর-প্রদেশের নানাস্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রায় তের লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের আর কোন সভ্যতাই এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে এই সভ্যতার চরম উন্নতি হয়েছিল। আর্যদের ভারতে আসার পর থেকে এই সভ্যতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

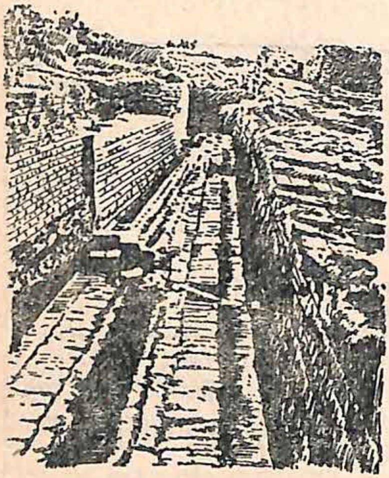


নগর পরিকল্পনা: সিন্ধু সভ্যতার প্রায় ২৫০টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে মাত্র ছয়টিকে শহর বলা যেতে পারে। এগুলি হল মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, চানহুদড়ো, লোথাল, কালিবাঙ্গান এবং বানোয়ালি।

উন্নত নগর পরিকল্পনা সিন্ধু সভ্যতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা শহরকে সুপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা হয়েছে। দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তাগুলি উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে

সোজাসুজি ছড়িয়ে পড়ে শহরকে নানা ছোটবড় বর্গ ও আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত করেছে। শহরের দুটি ভাগ—উঁচু জমিতে রাষ্ট্রপ্রধান ও বিত্তশালীদের জন্য তৈরী দুর্গ, বড় বড় বাড়ী, স্নানাগার ও শস্যাগার। বড় বাড়ীগুলির সঙ্গে গুদামঘর এবং মজুরদের থাকার জায়গা রয়েছে। আমদানী-রপ্তানীর সুবিধার জন্য শস্যাগারগুলি নদীকূলে অবস্থিত। নীচু জমিতে সাধারণ মানুষের বাস। এখানে রয়েছে একটি কি দুটি ঘর নিয়ে তৈরী সারি সারি মাটির বাড়ী। বড় বাড়ীর জন্য আগুনে পোড়ানো ইট ব্যবহার করা হত।

শহরের পৌরব্যবস্থা আমাদের বিস্মিত করে। অনেক বাড়ীতে খোলা বারান্দা, স্নানঘর এবং কুয়ো রয়েছে। বাড়ী ও রাস্তার জল ও ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃ-প্রণালীর চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল। অনেকগুলি রাস্তা ইট কিংবা পাথর দিয়ে তৈরী। তৎকালীন মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের নগর এলাকায় শহরবাসীদের সুখ-সুবিধার জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা ছিল না।



মহেঞ্জোদড়োর পয়ঃপ্রণালী

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্য ঃ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও সিন্ধু নদীর বার্ষিক বন্যার ফলে প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকা উর্বর ও কৃষিযোগ্য ছিল। এখানকার মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী ছিল। প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপাদনের ফলে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও শহরের সূত্রপাত হয়েছিল।

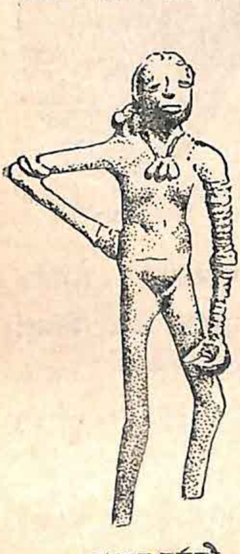
বিভিন্ন আহার্য বস্তুর মধ্যে ছিল গম, যব, বার্লি, খেজুর, নানা ফলমূল, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ। পরিধানের জন্য এখানকার

মানুষ সূতী ও পশম বস্ত্র ব্যবহার করত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল কুকুর, ভেড়া, ছাগল, গরু, মোষ, হাতী ইত্যাদি। স্থলপথে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ী ও নদীপথে নৌকার ব্যবহার ছিল।

নিত্য ব্যবহৃত জিনিষের মধ্যে রয়েছে কুমোরের চাকে তৈরী আগুনে পোড়ানো মাটির পাত্র এবং চীনামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও রূপার তৈরী পাত্র। অলঙ্কারপ্রিয় সিন্ধুবাসীদের জন্য তৈরী হত দামী ধাতুর তৈরী কারুকার্যময় অলঙ্কার। পোড়ামাটির তৈরী সস্তা গয়নারও প্রচলন ছিল। যন্ত্রপাতির মধ্যে কুঠার, করাত, বর্শা, ছুরি, ছেনি, কাঁচি নানা কাজে ব্যবহৃত হত। পোড়ামাটির তৈরী বিভিন্ন রকমের খেলনা দেখে মনে হয় যে তৎকালীন মানুষ শিশুদের আমোদপ্রমোদের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখত।

শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য

শিল্পকর্ম ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সিন্ধুসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ। এখানকার শিল্পীরা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা ও রূপার তৈরী নানা শিল্প-



ব্রোঞ্জের নর্তকী



দেবমূর্তি

দ্রব্যে তাদের দক্ষতার পরিচয় রেখেছে। তবে এই অঞ্চলে তামা ও

টিন দুষ্প্রাপ্য বলে পাথর ও পোড়ামাটির জিনিষপত্রের বেশ প্রচলন ছিল। মাটি এবং কাঠ দিয়ে কামার ও ছুতোররা বিভিন্ন রকমের জিনিষ তৈরী করত। বয়ন শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। পোড়া ইটে তৈরী বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় যে ইট ও বাড়ী তৈরীর কাজেও বহু লোক নিযুক্ত ছিল। নৌকা নির্মাণেও সিন্ধুবাসীদের যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে।



মাতৃমূর্তি

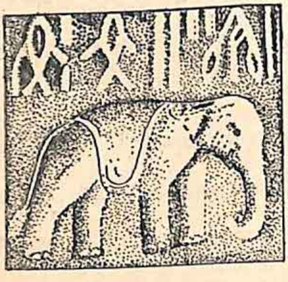


চিত্রিত মৃৎপাত্র

ধাতু, পাথর ও পোড়ামাটির বহু জিনিষে এখানকার কলাশিল্পী-দের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। নৃত্যরতা নারীর ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিটি শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। চিত্রিত মৃৎপাত্রগুলির রংবৈচিত্র্য এবং এগুলিতে উৎকীর্ণ ছবিগুলি শিল্পীদের অনায়াসলব্ধ প্রতিভার পরিচয় দেয়।

বাণিজ্য ঃ সিন্ধু উপত্যকায় কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু শিল্পকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম কাঁচামাল পাওয়া যেত না। বিশেষ করে তামা ও টিন বিদেশ থেকে আমদানী করতে

হত। এখানকার মানুষ বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য ও শস্য বিদেশে রপ্তানী করত। সিন্ধু উপত্যকার নিকটবর্তী অঞ্চল এবং ভারতের বাইরে আফগানিস্থান, পারস্য ও মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার লোকদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এখানকার মানুষ আরব সাগর থেকে নিয়মিত মাছ আমদানী করত। সুমেরীয় লিপিতে মেলুহার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন নাম হল মেলুহা। সুমেরীয় লিপিতে মেসো-পোটেমিয়া ও মেলুহার মধ্যবর্তী এলাকায় দিলমুন এবং মাকান নামে দুটি বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বর্তমান বাহেরিন বন্দরই খুব সম্ভবত দিলমুন নামে পরিচিত ছিল। মেসোপোটেমিয়ার আক্কাদ অঞ্চলে ভারতীয় বণিকদের যে একটি উপনিবেশ ছিল তারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেসো-পোটেমিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার অনেক শীলমোহর



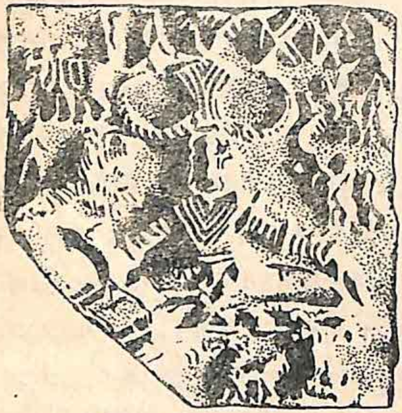


শীলমোহর

পাওয়া গেছে। এগুলি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত কিনা বলা যায় না। শীলমোহরগুলিতে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তবে মনে হয় যে, অন্যান্য দেশের প্রাচীন লিপির মত এখানেও শাসনকার্যের প্রয়োজনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তির হিসাব রাখার জন্যই লিপির প্রচলন শুরু হয়।

পূজাপদ্ধতি ঃ অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তি থেকে সিন্ধু সভ্যতার লোকদের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। মাতৃমূর্তির

সংখ্যাই বেশী। এখানকার মানুষ হয়তো মাটির উর্বরাশক্তিকে মাতৃদেবীরূপে পূজা করত। একটি শীলমোহরে রয়েছে পদ্মাসনে উপবিষ্ট এক যোগীমূর্তি। তার চারপাশে রয়েছে নানা জীবজন্তু।



পশুপরিবেষ্টিত ধ্যানমগ্ন দেবমূর্তি

শিবের সঙ্গে এই যোগীমূর্তির যথেষ্ট মিল রয়েছে। শীলমোহরে অঙ্কিত গাছপালা ও জীবজন্তুর ছবি দেখে মনে হয় এদের পবিত্র জ্ঞানে পূজা করা হত। সব কিছুতেই ঈশ্বর বিরাজ করেন—এখানকার লোকদের বোধ হয় এরকম কোন ধারণা ছিল। এখানে কোন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মনে হয় যে, এখানকার পূজাপদ্ধতিতে পুরোহিতদের কোন স্থান ছিল না।

প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে সমাজে শ্রেণীভেদ সম্পর্কে আলোকপাত ঃ সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন ধরণের নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করলে সে যুগের সমাজের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা জন্মে। অনেক জায়গা জুড়ে বহুতল (২।৩ তল) বাড়ীতে রয়েছে গুদামঘর ও মালবাহকদের থাকার জায়গা। এই বাড়ীগুলি পোড়া ইটে তৈরী। এইসব বড় বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ থেকে মূল্যবান তৈজসপত্র ও অলঙ্কারাদি পাওয়া গেছে। মনে হয় এই বাড়ীগুলিতে বিত্তশালী শ্রেণীর মানুষরা বসবাস করত। অন্যদিকে এইসব বাড়ীর পাশেই রয়েছে দু-একটি ঘরের ছোট ছোট মাটির বাড়ী। মূল্যবান আসবাবপত্র ও অলঙ্কারের নিদর্শন এখানে খুবই কম পাওয়া গেছে। এই বাড়ীগুলির বাসিন্দারা যে নিম্নবিত্তের মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন মানের জিনিসপত্রের প্রচলনও

আর্থিক শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু ও পাথরের তৈরী অলঙ্কারের পাশাপাশি পোড়ামাটির সস্তা গহনারও অজস্র নমুনা মেলে। শীলমোহরগুলি অপূর্ব শিল্পসুষমার দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে পোড়ামাটির খেলনা বা মূর্তিগুলির নির্মাণকৌশল অত্যন্ত নীচু স্তরের। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য কারিগররা নিশ্চয়ই বিভিন্ন মানের শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করত। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেই যে মানুষের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের সূচনা হয়েছিল, সিন্ধুসভ্যতার এই নিদর্শনগুলি তার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

(ঘ) চীন

হোয়াং হো এবং ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপত্যকা : মেসো-পোটেমিয়া, মিশর এবং ভারতের সিন্ধু সভ্যতার মত চীনের প্রাচীন সভ্যতাও নদীতীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। হোয়াং হো এবং ইয়াং সিকিয়াং নদীকূল প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার আদিকেন্দ্র। এখানেও বন্যার জলকে বাঁধ দিয়ে আটকানো এবং সেচকার্যে ব্যবহারের জন্য মানুষকে দলবদ্ধভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এখানকার মানুষ নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগটুকুও গ্রহণ করেছিল।

চীনের প্রাচীনতম ইতিহাস : অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ সালে চীনের পশ্চিম থেকে আগত একদল মানুষ হোয়াং হো এবং উই নদীর সঙ্গমস্থলে বসতিস্থাপন করতে আরম্ভ করে। চীনের পৌরাণিক কাহিনীগুলির মতে এরা চীনে প্রবেশের পূর্বেই উন্নত ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। কৃষিকর্ম, পশুপালন, গৃহনির্মাণ, এমন কি রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থাও এদের অজানা ছিল না। চীনের আদিম অনগ্রসর অধিবাসীদের সঙ্গে এদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে হোয়াং হো নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকায় এদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

কিম্বদন্তী অনুসারে সিয়া রাজবংশ চীনে প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

করে। খৃষ্টপূর্ব ২২০৫ সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করে। এই বংশের প্রথম রাজা ই। চীনের ঐতিহাসিকরা এই রাজাকে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁর রাজ্যকে ন'টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। পশ্চিমে 'চলন্ত বালুরাশি' অর্থাৎ গোবি মরুভূমি পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে অনেক অসভ্য উপজাতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। পরবর্তী আঠারো জন রাজা ছিলেন অকর্মণ্য। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব ১৭৬৬ সালে শাং বংশের বীর তাং রাজক্ষমতা দখল করেন।

চীনের পৌরাণিক কাহিনী (বিশেষ করে বন্যা সম্পর্কে)

প্রত্যেক দেশেই প্রাচীন যুগের ইতিহাস নিয়ে নানা পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। চীনের প্রাচীন ইতিহাসেও বহু পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। তবে চীনে কোন পৌরাণিক কাব্য নেই, যা গ্রীস ও ভারতে রয়েছে। চীনের পৌরাণিক কাহিনীগুলি গদ্যে রচিত।

চীনের প্রাচীন কাহিনীগুলিতে একদিকে যেমন রাজারাজড়াদের গল্প রয়েছে, অন্যদিকে বন্যার প্রকোপে জনজীবন কতদূর বিপর্যস্ত হত তারও পরিচয় মেলে। একটি গল্পে এক ভয়াবহ বন্যার বিবরণ রয়েছে। সেই বিধ্বংসী বন্যায় একমাত্র পর্বতচূড়াগুলি ছাড়া সারা দেশ জলময় হয়েছিল, পর্বতচূড়ায় উঠে লোকেরা প্রাণ বাঁচিয়েছিল। প্রায় দশ বছর সেই জল আর কমেনি। অবশেষে এক মহান বীর দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনেক খাল কাটলেন, নদীখাত-গুলিকে গভীর করলেন। জল নদীতে ফিরে গেল। মানুষ আবার তাদের ঘরে ফিরল।

নদীতীরবর্তী সভ্যতাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের মধ্যে আফ্রিকার মিশরে এবং এশিয়া মহাদেশের মেসোপোটেমিয়া, ভারত ও চীনে মানবসভ্যতার সূচনা হয়। প্রত্যেকটি সভ্যতারই কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল,

তবে কিছু মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও এ:দের মধ্যে কতগুলি গভীর মিলও দেখা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ঃ এইসব অঞ্চলের মানুষ প্রায় একই সময়ে কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করে উন্নত কৃষিব্যবস্থার সূচনা করেছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় নদীতীরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা বুঝেছিল যে ঐসব নদীর বন্যাকে প্রতিরোধ করতে হলে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্যের সূত্রেই বন্যার জলকে বাঁধ দিয়ে আটকানো সম্ভব হয়েছিল। দীর্ঘকাল একত্রে কাজ করার ফলে এই সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা হ্রাস পেল। গোষ্ঠীস্বার্থের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিল। এখন থেকে এই সব অঞ্চলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াইয়ের ঘটনা অনেক কমে গেল। এদিক থেকে বিচার করলে নতুন সভ্যতার বিকাশ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল।

সভ্যতার বিকাশের ফলে মানবসমাজে আরেকটি বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। সেটি হল সমাজে শ্রেণীভেদের সূচনা। প্রস্তর যুগে পাথরের সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে গোষ্ঠীর সব মানুষ তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকত। সব মানুষকেই সব কাজ মিলেমিশে করতে হত। সুখদুঃখ সবই সমান ভাবে ভাগ করে নিতে হত। প্রস্তরযুগে দাস প্রথার উদ্ভবও সম্ভব ছিল না। যেখানে প্রয়োজনের বেশী কিছু উৎপন্ন করা কঠিন সেখানে পরাজিত শত্রুকে বন্দী করে কোন লাভ নেই। অভাবের যুগে বন্দী শত্রুরা বিজয়ীদের কাছে এক বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াত। তাই প্রস্তর যুগের মানব সমাজে কোন শ্রেণীভেদের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

সভ্যতার যুগে ধাতুর ব্যবহার সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিল। পাথরের যন্ত্রপাতিতে কাজ করার অসুবিধা ছিল বটে, কিন্তু এগুলি যে কোন মানুষের পক্ষেই সহজে যোগাড় করা সম্ভব। পাথরের যন্ত্রপাতি

পুরানো হলে বা ভেঙ্গে গেলে সহজে বদল করাও সম্ভব। কিন্তু তামা এবং ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে জিনিষপত্র তৈরী করা শুরু হলে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যাপারটি যথেষ্ট জটিল হয়ে গেল। ধাতু মূল্যবান বস্তু। বিশেষ করে পলিসমৃদ্ধ নদীউপকূলে তামা ও টিন বেশ দুষ্প্রাপ্য। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সূচনায় শাসকশ্রেণী এই মূল্যবান ধাতুগুলি সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে মূল্যবান ধাতুর উপর উচ্চশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উৎপাদনের এক বড় উপাদান অর্থাৎ যন্ত্রপাতির উপর অধিকার হারিয়ে চাষী ও কারিগরশ্রেণীর স্বাধীনতা অনেক কমে গেল। নতুন সভ্যসমাজগুলিতে এইভাবে সামাজিক শ্রেণীভেদ শুরু হল। সভ্যসমাজগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই দাসপ্রথারও সূচনা হয়েছিল। সিন্ধুসভ্যতায় দাসপ্রথার প্রচলনের কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও অন্যত্র এই প্রথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য বা অন্যান্য জিনিষ উৎপন্ন করা সম্ভব। এখন থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচ্চশ্রেণীর মানুষ পরাজিত শত্রুকে হত্যা না করে দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করত। খামারে, খনিতে এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মে দাসদের বেগার খাটিয়ে অভিজাতরা তাদের আর্থিক সম্পদ দ্রুত বাড়িয়ে তুলেছিল। ধাতুর তৈরী যে উন্নত যন্ত্রপাতি মানবজীবনে উন্নতির আলোক দেখিয়েছিল, সেই ধাতব যন্ত্রপাতিই মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদের সূচনা করল। সভ্য সমাজে এখন তিনটি শ্রেণী দেখা দিল। এগুলি হচ্ছে (১) রাজা, পুরোহিত ও অভিজাতদের নিয়ে গঠিত শাসকশ্রেণী। সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলি এরাই ভোগ করত। (২) চাষী ও কারিগরের দল। এদের রাজনৈতিক বা আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না। (৩) সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে ছিল দাসের দল, যারা কোনপ্রকার মানবিক অধিকার ভোগ করত না। শাসকশ্রেণীর লোকরা এদের মানুষ বলেই মনে করত না।

আর্থিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য : আর্থিক ক্ষেত্রেও নদী-কেন্দ্রিক সভ্য সমাজগুলিতে একই ধরণের পরিবর্তন দেখা দেয়, কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে এইসব অঞ্চলের মানুষ বন্যার প্রকোপ যথেষ্ট হ্রাস করেছিল, কৃত্রিম খাল খননের ফলে এইসব অঞ্চলে অনাবৃষ্টি এখন কোন আশঙ্কার কারণ নয়। অজন্মার সময় নদীপথে বা কৃত্রিম খাল দিয়ে শস্যবাহী নৌকা ঘাটতি এলাকায় খাবার পৌঁছে দিতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবার ফলে সমাজের কিছু লোক নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে সভ্য সমাজগুলিতে শিল্পদ্রব্যের উৎকর্ষতা ও পরিমাণ দুটোই বেড়ে যায়। কিন্তু কৃষি ও শিল্পকর্মের উন্নতি হলেও চাষী ও কারিগরদের অবস্থায় কিন্তু কোন উন্নতি হল না। প্রস্তর যুগে যন্ত্রপাতি সহজলভ্য হবার দরুণ এগুলির জন্য চাষী-কারিগরকে কারুর দ্বারস্থ হতে হয়নি। কিন্তু দামী ধাতুর যন্ত্রপাতি যোগাড়ের ব্যাপারে রাজা, পুরোহিত ও অভিজাতরা একচেটিয়া কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন জিনিসের প্রায় সবটাই উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আত্মসাৎ করত। এই আর্থিক দুর্গতির জন্য তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেও অধিকাংশ চাষী নিজেদের জমি চাষ করার সময় পাথর বা কাঠের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। শুধুমাত্র যেসব চাষী ও কারিগর, রাজা, পুরোহিত এবং অভিজাতদের অধীনে কাজ করত তারাই ধাতুর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। সামাজিক অসাম্যের মত আর্থিক অসাম্যও প্রত্যেকটি সভ্য সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য : সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও সভ্য সমাজগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। প্রত্যেকটি নদীকেন্দ্রিক সভ্য সমাজেই শাসনব্যবস্থা, শহর ও লিখিত ভাষার আবির্ভাব হয়েছিল এবং ধর্ম, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল।

অনুশীলনী

ক। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ** ১। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুমেরবাসীদের অবদান সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ২। প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে কি জান? ৩। মিশরের বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৪। সিন্ধুসভ্যতার নগর পরিকল্পনার বিবরণ দাও। ৫। সিন্ধুসভ্যতার সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ৬। সিন্ধুসভ্যতার বাণিজ্যব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান? ৭। চীনের প্রাচীনতম ইতিহাসের বিবরণ লিখ। ৮। চীনের পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে কি জান? ৯। নদীতীরবর্তী সভ্যতাগুলির মধ্যে যেসব সাদৃশ্য আছে সেগুলি লিখ।

খ। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ** মেসোপোটেমিয়ার ভৌগোলিক পরিবেশ কিভাবে সভ্যতা বিস্তারে সাহায্য করেছিল? ২। সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র কোনটি? এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কি জান? ৩। বন্যাপ্রতিরোধের চেষ্টার ফলে মেসো-পোটেমিয়ায় কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়? ৪। সুমেরের আর্থিক জীবনে পুরোহিতের ভূমিকা সম্পর্কে কি জান? ৫। মেসোপোটেমিয়ায় মন্দিরের বিবরণ লেখ। ৬। সুমেরের বাণিজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? ৭। সুমেরে ব্যবহৃত লিপির নাম কি? এই নামের কারণ কি? ৮। টমাস হাইড কে? ৯। মিশরের ভৌগোলিক পরিবেশ কিভাবে সভ্যতাবিস্তারে সাহায্য করেছিল? ১০। 'ফ্যারাও' শব্দটির অর্থ কি? ফ্যারাওদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে কি জান? ১১। মিশরের পুরোহিতরা কিভাবে উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করত? ১২। 'হায়রোগ্লিফিক্' লিপি কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল? শব্দটির অর্থ কি? ১৩। প্রাচীন লিপির উদ্ভবের কারণ কি? ১৪। মিশরের লিপি-কাররা ক্ষমতাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল কেন? ১৫। মিশরের চাষী ও শ্রমিকদের অবস্থা কেমন ছিল? ১৬। মিশরের বণিকশ্রেণীর অবস্থা কেমন ছিল? ১৭। 'মমি' কাকে বলে? 'মমি' কোথায় রাখা হত? ১৮। 'পিরামিড' কাকে বলে? এগুলি তৈরী করা হত কেন? ১৯। একটি বিখ্যাত পিরামিডের নির্মাণকার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ২০। পিরামিডগুলিকে কিসের প্রতীক বলে গণ্য করা যেতে পারে? ২১। 'রা' এবং 'ওসিরিস্' কোন্ দেশের দেবতা? ২২। মিশরে মৃতদেহকে 'মমি' করে রাখা হত কেন? ২৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে বৃহত্তম সভ্যতার কেন্দ্র কোনটি? এর আয়তন সম্পর্কে তুমি কি জান? ২৪। সিন্ধুসভ্যতার চারটি শহরের নাম কর। ২৫। সিন্ধুসভ্যতার যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? বর্তমান ভারতের যাতায়াত ব্যবস্থার সঙ্গে এর কোন

মিল আছে কি? ২৬। সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার যে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল তার কি কি প্রমাণ রয়েছে? ২৭। সিন্ধুসভ্যতার পূজাপদ্ধতিতে পুরোহিতের কি ভূমিকা ছিল? মিশরীয় পুরোহিতদের সঙ্গে এদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি? ২৮। চীনের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কোথায়? ২৯। চীনের প্রথম রাজবংশের নাম কি? ৩০। ই কোন্ দেশের রাজা? তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৩১। চীনের পৌরাণিক কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য কি? ৩২। সমাজে শ্রেণীভেদের সূচনা হয়েছিল কেন? ৩৩। দাসপ্রথার উদ্ভবের কারণ কি? কোন্ সময়ে এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল?

গ। **বিষয়মুখী প্রশ্ন**: ১। সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর:— (ক) ইরাকের প্রাচীন নাম হল ——। (সিন্ধু, মিশর, গ্রীস, মেসোপোটেমিয়া, আক্কাদ, ব্যাবিলন)। (খ) সুমেরে প্রত্যেকটি শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি —— থাকত। (জলাশয়, রঙ্গভূমি, মন্দির)। (গ) সুমেরীয় লিপির নাম হল —— লিপি। (ব্রাহ্মী, হায়রোগ্লিফিক্, কিউনিফর্ম)। (ঘ) টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী —— অবস্থিত। (পারস্যে, প্যালেষ্টাইনে, মিশরে, মেসোপোটেমিয়ায়)। (ঙ) ইরেক্, ইরিদু, লাগাস্ এবং উর প্রভৃতি শহরগুলি —— অবস্থিত। (গ্রীসে, রোমে, পারস্যে, মেসোপোটেমিয়ায়)। (চ) প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা —— কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো। (কঙ্গো নদীকে, শোন নদীকে, নীল নদীকে)। (ছ) 'ফ্যারাও' শব্দের অর্থ হল —— বা ——। (ভাষা, ধর্মগ্রন্থ, বৃহৎ অট্টালিকা, মন্দির, পবিত্র লিপি, দেবভাষা)। (জ) 'হায়রোগ্লিফিক্' শব্দের অর্থ হল ——। (দেবভাষা, মন্দির, সম্রাট)। (ঝ) প্রাচীন মিশরের সযত্নে রক্ষিত মৃতদেহকে —— বলা হয়। (ফসিল, মমি)। (ঞ) উন্নত —— পরিকল্পনা সিন্ধুসভ্যতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। (সেচ, ক্রীড়াভূমি, নগর)। (ট) —— সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের ব্যাপারে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (সুমেরীয়, মিশরীয়, সিন্ধু)। (ঠ) চীনের পৌরাণিক কাহিনীগুলি —— রচিত। (গদ্যে, পদ্যে)।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগের সমাজ

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার—এর প্রভাব : তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যেসব সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, চতুর্থ অধ্যায়ে সেগুলি আলোচিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে লোহার ব্যবহার পরবর্তী মানব-ইতিহাসের আরেকটি বড় ঘটনা।

আনুমানিক ২০০০ খৃষ্টপূর্বে লোহার ব্যবহারের কথা জানা গেলেও খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের পর থেকেই লোহার নিয়মিত ব্যবহার আরম্ভ হয়। এশিয়া মাইনর (বর্তমান তুরস্ক) অঞ্চলে হিটাইট্ জাতির লোকরা সর্বপ্রথম লোহাকে আগুনে উত্তপ্ত করে সেই উত্তপ্ত লোহা থেকে যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজ শিখেছিল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ সালের পর থেকে ভারতে বসবাসকারী আর্যরা লোহা ব্যবহার করেছিল।

তামা এবং ব্রোঞ্জের তুলনায় লোহা অনেক সহজলভ্য, কমদামী এবং অনেক বেশী মজবুত। লোহা দিয়ে তৈরী সস্তা কাস্তে, লাঙ্গল, বেলচা, কোদাল দিয়ে সহজে এবং ভালভাবে চাষ করা যায়। লোহার হাতুড়ি, নেহাই, সাঁড়াশী, বাটালি, করাত, পেরেক, তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির তুলনায় অনেক বেশী শক্ত। নানাধরণের শিল্পকর্মের পক্ষে এগুলি বেশ উপযোগী। তামার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র মূল্যবান হলেও সহজে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সস্তা লোহার অস্ত্রাদি যুদ্ধে অনেক বেশী কার্যকরী। রাষ্ট্রই তামা ও টিন সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিল। জিনিষপত্র তৈরীর উপকরণগুলিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকরাই তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিষপত্র কিনত। দামী ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। তাই তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের উপর

একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। সস্তা লোহার প্রচলনের পর সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিল।

লৌহযুগে সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল কাঠামো ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে রাষ্ট্রশাসন, ধর্ম ও যুদ্ধের সূত্রে সমাজের অল্পসংখ্যক মানুষ উন্নত জীবনযাত্রার সুবিধাগুলি আত্মসাৎ করেছিল। সমাজের উচ্চস্তরে ছিল রাজা, পুরোহিত এবং অভিজাতশ্রেণী। নিম্নস্তরে ছিল সাধারণ চাষী, কারিগর এবং দাসের দল। সস্তা লোহার প্রচলনের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে যে উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়নি। উপরন্তু অসাম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধে লোহার অস্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ মানব জীবনের এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। পরাজিত শত্রুদের দাসত্ব বরণ করতে হত। দাসপ্রথা লৌহযুগের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষি ও শিল্পকর্মে দাসদের বিনা বেতনে খাটিয়ে অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকরা বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে দাসপ্রথার সূচনা হলেও এর চরম বিকাশ ঘটেছিল লৌহযুগে।

লোহার যন্ত্রপাতির প্রচলনের পর থেকে চাষী ও কারিগররা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জিনিসপত্র উৎপাদন করেছিল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ল এবং এক নতুন শক্তিশালী বণিক-মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব হল। গ্রীস ও রোমে এই নতুন শ্রেণী প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছিল।

লৌহযুগে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের পরিমাণ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ার ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ ও বাজারের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই আর্থিক উন্নতির সূত্রে অনেক নতুন শহরের সৃষ্টি হয়। পণ্য ও বাণিজ্যের পরিমাণ এবং বাজারের সংখ্যা বেড়ে গেলে প্রাচীন বিনিময় প্রথায় জিনিসপত্র কেনাবেচা করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তাই জিনিসের দাম ঠিক করার জন্য মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতক থেকে

ভারতে শহরের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, মুদ্রার ব্যবহারও শুরু হয়।

লৌহযুগে রাজক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে রাজক্ষমতার আবির্ভাব হয়েছিল। লৌহযুগে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এযুগে ব্যাবিলন ও পারস্যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হয়। আমাদের দেশে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে ষোলটি বড় রাজ্য ছিল, তার মধ্যে মগধের রাজারা ধীরে ধীরে প্রতাপশালী হন।

কিন্তু ইতিহাসের গতি সর্বত্র সমান নয়। তাই এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও ইউরোপে তা হয়নি। লৌহযুগের সূচনায় গ্রীসের বহু রাজ্যে ও রোমে অভিজাতশ্রেণী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করেছিল।

ব্যাবিলন

কৃষি ও বাণিজ্য ঃ প্রায় ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সেমিটিক জাতির এক শাখা ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। খৃষ্টপূর্ব আঠার শতকে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি সমগ্র মেসোপোটেমিয়া দখল করেন। তাঁর রাজত্ব-কালে এই শহর এত বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিল যে, প্রাচীন যুগ থেকে হামুরাবির রাজত্বকাল পর্যন্ত মেসোপোটেমিয়ার ইতিহাসকে সাধারণত ব্যাবিলনের ইতিহাস বলা হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ব্যাবিলন অঞ্চলে উন্নত কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। হামুরাবির সুশাসনে এই উন্নত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। অনেকগুলি পোড়া মাটির খণ্ডে খোদাই করা লিপি থেকে জানা যায় যে, ইউফ্রেটিস্ নদী ও তৎসন্নিহিত খালগুলি যাতে মাটি জমে ভরাট না হয় সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি বাণিজ্যপথগুলিতে উপযুক্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

মন্দির ও পুরোহিত শ্রেণীঃ প্রাচীন ব্যাবিলন বা মেসোপোটেমিয়াতে রাজনৈতিক অনৈক্য, বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন এবং ঘন ঘন যুদ্ধ হলেও প্রাচীন ধর্ম ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন হয় নি। প্রত্যেক রাজাই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার ও নতুন মন্দির নির্মাণে উৎসাহদান করেছিলেন। রাজারা পুরোহিতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্যাবিলনে সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে সমস্ত কৃষিকাজ ও শিল্পকর্ম পুরোহিতদের নির্দেশ অনুযায়ী চলত। মন্দিরের দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বিশাল ভূসম্পত্তি ও প্রচুর ধনরত্নের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার ছিল পুরোহিতদের উপর। এই সূত্রে পুরোহিতরা বিশাল ঐশ্বর্য এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। কৃষিকাজ ও শিল্পকর্মের উন্নতি এবং সুষ্ঠুভাবে দেবোত্তর সম্পত্তি পরিচালনার খাতিরে পুরোহিতরা শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ প্রাচীন ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস মানব-ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কিউনিফর্ম লিপির ব্যবহার, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে নানা মৌলিক আবিষ্কার ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবদান। কৃষি ও শহরের আবির্ভাব, বাণিজ্যের প্রসার এবং বিভিন্ন মন্দিরের বিশাল সম্পত্তি-গুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টার সূত্রে ব্যাবিলনে জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটেছিল।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের মানুষ যে কত উন্নত ছিল নিপ্পুর মন্দিরের গ্রন্থাগার তার এক বড় উদাহরণ। এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিউনিফর্ম লিপির মৃন্ময় চাকতি পাওয়া গেছে। এই লিপির সাহায্যে বড় বড় সংখ্যার অঙ্ক সহজে প্রকাশ করা যেত। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে ব্যাবিলনের মানুষ ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে অঙ্কপাতনের নিয়ম ব্যবহার করেছিল। নিপ্পুর মন্দিরে কতগুলি নামতার তালিকাও পাওয়া গেছে। এগুলির সাহায্যে বিভিন্ন রাশির গুণ, ভাগ, বর্গ ও বর্গমূল সহজেই নির্ণয়

করা যেত। বীজগণিতের ক্ষেত্রেও ব্যাবিলনবাসীদের যথেষ্ট অবদান আছে।

জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলনেও ব্যাবিলনবাসীদের যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে। বছরের বারমাস, সপ্তাহের সাত দিন, প্রতিদিনের দিনরাত্রির হিসাব—এগুলি এই সভ্যতার সৃষ্টি। গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য, গ্রহদের গতি, গ্রহণের কাল নির্ধারণ এবং ক্রান্তি-বিন্দুর অয়ন-চলন আবিষ্কারের কৃতিত্বও ব্যাবিলনবাসীরা দাবী করতে পারে। ব্যাবিলনের রাজারা জ্যোতির্বিদ্যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁদের আদেশে জ্যোতির্বিদ ও নক্ষত্রদর্শকরা নিয়মিত-ভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করত এবং পঞ্জিকা প্রণয়ন ও সংস্কারের কাজ করত। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের আগে থেকেই যে গ্রহ-তারার গতিবিধি ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হত তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাবিলনবাসীরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়নি। বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশরীয় ও ভারতীয়রা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

সম্রাট হামুরাবির আইনবিধি ও তৎকালীন ব্যাবিলনীয় সমাজ ঃ ২৮২টি ধারাসম্বলিত হামুরাবির আইনবিধি একটি প্রস্তরগাত্রে খোদিত রয়েছে। ব্যাবিলনের সমাজ সম্বন্ধে জানতে হলে এই আইনবিধি আমাদের পড়তেই হবে।

রাজা, পুরোহিত এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই আইনবিধি রচিত হয়েছিল। একই অপরাধে অভিযুক্ত হলে নিম্নশ্রেণীর অপরাধীরা যে ধরণের শাস্তি পেত, অভিজাত বংশজাত অপরাধীরা সেই তুলনায় অনেক লঘু শাস্তি পেত। সমস্ত দেশজুড়ে দাসপ্রথা বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। পলাতক দাসদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। ঋণী ব্যক্তিকে অনেক সময় দাসত্ব বরণ করতে হত। পরিবারে সন্তানের উপর পিতার এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব খুবই বেশী ছিল। রাজা ও পুরোহিতশ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ-

গ্রহণ করতেন। কৃষি ও শিল্পকর্মের উন্নতি হলেও ব্যাবিলনের সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিশেষ উন্নতি হয়নি, এই আইনবিধি তার বড় প্রমাণ।

মিশর

মিশরের রাজ্যবিস্তার ঃ খৃষ্টপূর্ব আঠার শতকে হিক্‌সস্ নামে এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি মিশর জয় করে প্রায় শতাধিক বছর রাজত্ব করেছিল। এরপর ফ্যারাও প্রথম আহ্‌মোসের নেতৃত্বে মিশরীয়রা তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। এই সময় থেকে মিশর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ফ্যারাওরা বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করতে আরম্ভ করেন। এক বিশাল পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী সৈন্যদল এবং শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে মিশর, আফ্রিকার নুবিয়া এবং লিবিয়া ও এশিয়ার সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন দখল করে। বিজিত দেশগুলি থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্নে সম্রাটের কোষাগার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রবাদ আছে যে, ফ্যারাওদের ধনাগারে সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ মিশরের মরু অঞ্চলের বালুকারাশির মতই অফুরন্ত। বিজয়ী ফ্যারাওরা বিজিত দেশের অগণিত মানুষকে দাসে পরিণত করেন। ফ্যারাওরা তাঁদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি জাহির করার জন্য বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গ করেন। মিশরের রাজধানী থিব্‌স্ শহরের প্রধান উপাস্য দেবতা 'আমন রা'র মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য লেবাননের এক বিশাল এলাকা দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। থিব্‌সের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের অধীনে প্রায় আট লক্ষ দাস কাজ করত।

ফ্যারাও চতুর্থ আমেনহোটেপের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৪১১—১৩৭৫ খৃষ্টপূর্ব) মিশর সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সারা দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁর মৃত্যুর পর

থেকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে সাম্রাজ্যের শক্তিতে ফাটল ধরে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব হয়। দীর্ঘকাল পরে ফ্যারাও দ্বিতীয় র‍্যাম্‌সেসের রাজত্বকালে (১২৯২—১২২৫ খৃষ্টপূর্ব) মিশরের লুপ্তগৌরব কিছুটা ফিরে আসে। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে মিশরের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ক্রমাগত যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। চাষীদের অসন্তোষ, দাসদের বিদ্রোহী মনোভাব এবং পদানত রাজ্যগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে ফ্যারাওদের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল এবং মিশরের দক্ষিণে নুবিয়া ফ্যারাওদের হস্তচ্যুত হয়। মিশরের স্বাধীন অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ সালে পারস্য সম্রাট ক্যাম্বিসেস্ মিশর আক্রমণ করলে মিশরীয় সৈন্যরা প্রায় বিনা যুদ্ধে পরাজিত হয়। মিশরের অভিজাত ও পুরোহিতশ্রেণী বিদেশী রাজশক্তিকে সমর্থন করে। এইভাবে মিশরের গৌরবময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।



ফ্যারাও দ্বিতীয় র‍্যাম্‌সেস

মিশরের পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতা ঃ প্রাচীন মিশরে পুরোহিতরা চিরকালই বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করত। মিশরের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাওদের দানে পুষ্ট হয়ে পুরোহিতদের ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পায়। মিশরের সাধারণ মানুষ পুরোহিতদের ভয় ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ধনী ও প্রভাবশালী পুরোহিতরা কালক্রমে

ফ্যারাওদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। ফলে ফ্যারাওদের সঙ্গে পুরোহিতদের তীব্র বিরোধের সূচনা হয়।

খৃষ্টপূর্ব পনের শতকের শেষভাগে চতুর্থ আমেনহোটেপ নামে একজন ফ্যারাও পুরোহিতদের ক্ষমতা খর্ব করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রাচীন দেবতাদের পূজার পরিবর্তে তিনি একমাত্র সূর্যদেবতা 'আটোন'-এর উপাসনা প্রবর্তন করেন। এই নতুন দেবতার নামে সারা দেশে মন্দির নির্মিত হয়। ফ্যারাও নিজে 'ইখ্‌নাটন' বা 'আটোনপ্রিয়' এই নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মিশরের সাধারণ মানুষ প্রাচীন ধর্মমত সহজে ত্যাগ করতে রাজী হল না। পুরোহিতরাও নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছিল। ফলে চতুর্থ আমেনহোটেপ বা ইখ্‌নাটনের মৃত্যুর পর প্রাচীন পূজাপদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পুরোহিতদের ক্ষমতা ও প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। পুরোহিতদের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে।

পারস্য

পারস্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রের উত্থান ঃ মেসোপোটেমিয়ার প্রতিবেশী দেশ পারস্য। প্রাচীনকাল থেকে মেসোপোটেমীয় সভ্যতার আলোক অতি সহজেই পারস্যে প্রবেশ করেছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে পারস্যবাসীরা কুমোরের চাক, তামা এবং লিখিত ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল। কালক্রমে আর্যজাতির এক শাখা পারস্যে প্রবেশ করে এবং প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সম্রাট কাইরাসের নেতৃত্বে পারস্য একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। মেসোপোটেমিয়া ও এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্ক) এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে। বিজিত দেশের অধিবাসীদের আনুগত্যলাভের জন্য

কাইরাস এদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্ত দেশের সাহায্যে মিশরকে পরাস্ত করাই ছিল কাইরাসের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের পূর্বেই কাইরাসের মৃত্যু হয়। কাইরাসের পুত্র ক্যাম্বিসেস্ পিতার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন।

পরবর্তী সম্রাট দারিয়ুসের রাজত্বকাল (৫২২-৪৮৬ খৃষ্টপূর্ব) পারস্য ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি সিন্ধুনদীতে একটি নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। ভারতে রাজপুতানার মরু অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়েছিল। বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যকে যে কুড়িটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে এই অঞ্চলটি ছিল বিশেষ জনবহুল ও সমৃদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পারস্যের দুর্বলতার সুযোগে এই অঞ্চলে অসংখ্য প্রায়স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আলেকজাণ্ডারের পক্ষে ভারত আক্রমণ করা সহজ হয়েছিল।

পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে সম্রাট দারিয়ুসের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। তিনি সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে কুড়িটি 'স্যাট্রাপি' বা অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন। সম্রাট স্বয়ং প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যকে কর হিসাবে সম্রাটকে অর্থ কিংবা জিনিসপত্র দিতে হত। দারিয়ুসের রাজত্বকালে মিশরকে প্রায় দেড়লক্ষ সৈন্যের জন্য গম সরবরাহ করতে হত। মুদ্রাসংস্কার ও উন্নত সড়কব্যবস্থার জন্যও দারিয়ুস খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'দারিক' নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। উপযুক্ত মুদ্রাব্যবস্থা, যাতায়াতের জন্য সড়ক ও সাম্রাজ্যের সর্বত্র উপযুক্ত নিরাপত্তা থাকার ফলে পারস্য সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

দারিয়ুস ও পরবর্তী সম্রাট জারেক্সেস্ গ্রীসদেশ দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতাসংগ্রামে

এথেন্সের ভূমিকা ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। এরপর পারস্যের ক্ষমতা ক্রমশই কমে যায় এবং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য দখল করেন।

জরথুস্ত্র ঃ যুদ্ধবিগ্রহই পারস্যের প্রাচীন ইতিহাসের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। সুসা, পাসার্গাদা এবং পার্সেপোলিস্ নগরগুলির ধ্বংসাবশেষ পারস্যের প্রাচীন শিল্পকলার উৎকর্ষের নীরব সাক্ষী। মহাপুরুষ জরথুস্ত্রের ধর্মীয় মতবাদ বর্তমানযুগের মানুষেরও পরম শ্রদ্ধার বস্তু।

জরথুস্ত্রের জীবনকাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। হয়তো তিনি মহাবীর ও বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী যুগের মানুষ। মহাবীর ও বুদ্ধদেব যেমন প্রচলিত বৈদিক ধর্মের নানা ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি জরথুস্ত্রও পারস্যের প্রচলিত ধর্মে নানা অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাঁর ধর্মমত 'আভেস্তা-ই-জেন্দ্' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভারতে বসবাসকারী পার্শীদের এটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

জরথুস্ত্রের মতে জগতে ভালো এবং মন্দ এই দুই বিপরীত শক্তি পরস্পর অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। দেবতা আহুরা মাজ্দা ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। শয়তানের দেবতা হচ্ছেন আহ্রিমান্। এঁদের মধ্যে যে অবিরাম সংগ্রাম চলছে, তাতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দেবতা আহুরা মাজ্দার জয় অনিবার্য। বিভিন্ন সদ্গুণ অর্জন করে মানুষকেও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। জরথুস্ত্র মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইহুদীজাতি

মিশরে ইহুদীজাতি—মোজেসের নেতৃত্বে অত্যাচারিত ইহুদীদের মিশর ত্যাগ ঃ ইউফ্রেটিস্ নদীর উপত্যকা অঞ্চলে হিব্রুভাষী ইহুদীদের আদি বাসস্থান। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের যুগে ইহুদীরা তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ

চেষ্টা করেছিল। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ সালের পর ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে নতুন বসতি গড়ে তোলে এবং কালক্রমে প্যালেষ্টাইন ইহুদীদের মাতৃভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ইহুদীদের এক বিরাট অংশ আশ্রয়ের খোঁজে মিশরে চলে যায়। কিন্তু মিশরীয়রা এই ইহুদীদের দাসত্ববরণ করতে বাধ্য করে। দেশত্যাগী ইহুদীদের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করেন মোজেস্। তাঁর নেতৃত্বে ইহুদীরা মিশর ত্যাগ করে প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তন করে। ইহুদীরা এখনও এই ঘটনাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এতদিন ইহুদীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং নানা দেবতার পূজা করত। মোজেস্ এই গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর নির্দেশে ইহুদীরা বহু দেবতার পূজা ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বর যেহোভার আরাধনা আরম্ভ করে। প্যালেষ্টাইনে এক স্বাধীন ইহুদীরাজ্যের সূচনা হয়। কিন্তু ইহুদীদের সৌভাগ্য-রবি বেশীদিন স্থায়ী হল না। ফিলিষ্টাইন নামে এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি ইহুদীদের প্যালেষ্টাইন থেকে বিতাড়িত করে ঐ অঞ্চল দখল করে।

ইহুদীদের অনির্বাণ স্বাধীনতাস্পৃহা: আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১০২৫ সালে ইহুদীরা সলের নেতৃত্বে ফিলিষ্টাইনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সল আত্মহত্যা করেন। সলের শূন্যস্থান পূরণ করলেন সুযোগ্য রাজনীতিবিদ্, কৌশলী সমরনায়ক, ধর্মপ্রাণ ডেভিড। তাঁর নেতৃত্বের গুণে ইহুদীরা ফিলিষ্টাইনদের পরাজিত করে হৃতরাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়। এরপর রাজা সলোমনের রাজত্বকালে প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরা আর্থিক সমৃদ্ধিও অর্জন করে। কিন্তু সলোমনের রাজত্বের শেষে করভারে জর্জরিত প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হয় এবং তীব্র অন্তর্বিরোধের ফলে প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরাজ্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটির নাম ইজরায়েল অপরটির নাম জুডা। খৃষ্টপূর্ব ৭২২ সালে আসিরিয়ার রাজা দ্বিতীয় সার্গোন হীনবল

ইজরায়েল রাজ্য জয় করেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যাবিলনের নেবুকাড্নেজার জুডা দখল করেন। যুদ্ধের সময় জেরুজালেম শহরের ইহুদীরা নেবুকাড্নেজারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছিল। ক্রুদ্ধ নেবুকাড্নেজার শহরটি পুড়িয়ে ফেলেন এবং প্রায় দশহাজার ইহুদী পণ্ডিতকে বন্দী করেন। এইভাবে ইহুদীদের স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্যের ক্ষমতাশালী আকেমেনীয় রাজবংশ প্যালেষ্টাইন দখল করেছিল। কিন্তু পারস্য সম্রাটরা ইহুদীদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করেন নি। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সাম্রাজ্য জয় করলে ইহুদীরা গ্রীকদের অধীন হয়ে পড়ে। কালক্রমে গ্রীক সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমানরা ইহুদীদের পদানত করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ইহুদীরা রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। চারবছর কঠোর সংগ্রামের পর ৭০ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। রোমানরা জেরুজালেম শহরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। অসংখ্য ইহুদীকে হত্যা করা হয় এবং অগণিত ইহুদী নরনারী প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হয়েও ইহুদীরা কিন্তু মাতৃভূমি প্যালেষ্টাইন পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করেনি। বর্তমান শতকের মধ্যভাগে স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হলে ইহুদীদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

গ্রীস

গ্রীসে সভ্যতা বিস্তারের ক্ষেত্রে ক্রীট দ্বীপের ভূমিকা ঃ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বল্কান উপদ্বীপে গ্রীসদেশ। লৌহযুগের সূচনায় এই অঞ্চলে এক মহান সভ্যতার উদ্ভব হয়। প্রাচীন গ্রীস হল ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি।

ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতা গ্রীসে সভ্যতা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। গ্রীসের দক্ষিণে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের লোকেরা

প্রাচীনকাল থেকে বাণিজ্যের সূত্রে নানা দেশ বিশেষ করে মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। কালক্রমে ক্রীটবাসীরা



ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি শহর গড়ে তুলেছিল। এগুলির মধ্যে ক্রীটে নসস্ এবং ফেস্‌টাস্, গ্রীসে মাইসেনা এবং টাইরিন্স এবং এশিয়া মাইনরে (বর্তমান তুরস্ক) ট্রয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রীটবাসীরা লিখিত ভাষার ব্যবহারও জানত। ক্রীটের এই সভ্যতা ইজিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। আনুমানিক ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে আর্যজাতির কয়েকটি শাখা গ্রীস, ক্রীট ও ইজিয়ান সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ইজিয়ান সভ্যতার কেন্দ্রগুলি দখল করে নেয়। গ্রীকভাষী এই আর্যরা উন্নত ইজিয়ান সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এক নতুন সভ্যতার সূচনা করে।

হোমারের যুগ ঃ মহাকবি হোমারের লেখা 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' নামে দুটি মহাকাব্য থেকে গ্রীক সভ্যতার আদি যুগের অনেক কথা জানা যায়। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১২০০ সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ৮০০ সাল পর্যন্ত গ্রীক জীবনের সুন্দর আলেখ্য কাব্যদুটিতে রয়েছে। যেহেতু হোমারের লেখা থেকে এই সময়ের গ্রীসের ইতিহাস জানা যায়, সেইজন্য এই কালকে 'হোমারের যুগ' বলা

হয়। হোমারের যুগে একদিকে যেমন বহু গ্রীক বণিক ও চাষী বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের মাধ্যমে সৎভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করত, অন্যদিকে ডাকাত ও জলদস্যুও নেহাৎ কম ছিল না। নানা ধরণের যুদ্ধাস্ত্র ও রথ তৈরীতে গ্রীক কারিগররা বেশ পটু ছিল। কায়িক শ্রমকে গ্রীকরা সম্মানের চোখে দেখত। হোমারের লেখায় দেখি, রাজা ইউলিসিস্ কৃষিকাজ করেন, তাঁর পালঙ্কটি তিনি নিজেই তৈরী করেছেন। রাণী পেনিলোপি সুতো কাটেন এবং কাপড় বোনেন। গ্রীকদের এই সরল জীবনযাত্রার চিত্রটি আমাদের মুগ্ধ করে। দেশ শাসনের ব্যাপারে রাজা অভিজাতদের পরামর্শ নিতেন। রাজাকে পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করতে হত।

নগররাষ্ট্র: গ্রীসের ভৌগোলিক বিশেষত্ব এখানকার রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। টাইগ্রিস্, ইউফ্রেটিস্ এবং নীলনদীর উপত্যকার বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু গ্রীস পাহাড়ময় দেশ, এখানকার নদীগুলি অগভীর ও খরস্রোতা। ফলে স্থলপথে যাতায়াত ও যোগাযোগের অসুবিধা ছিল খুব বেশী। এই অবস্থায় পাহাড় ও নদীঘেরা ছোট ছোট সমতল ভূমিতে কয়েকটি শহর নিয়ে অসংখ্য স্বাধীন নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এক জাতি ও এক ভাষার লোক হয়েও প্রাচীন গ্রীকরা সারা গ্রীস জুড়ে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। এই অসংখ্য নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্স সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল।

নগর রাজ্যগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ: গ্রীসে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। কিন্তু নানা কারণে বিভিন্ন রাজ্যের গ্রীক অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের সূত্রে এক পরম ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশে হিন্দুরা যেমন মহাভারত ও রামায়ণকে পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করে, তেমনি গ্রীকরাও ইলিয়াড ও ওডিসিকে পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করত। এই

দুই মহাকাব্যে বর্ণিত দেবদেবীরা গ্রীসের সর্বত্র পূজিত হতেন। ডেল্‌ফিতে অ্যাপোলো দেবতার দৈববাণীকে গ্রীকরা পরম শ্রদ্ধা



জিউস



অ্যাপোলো

করত। এছাড়া প্রতি চার বছর অন্তর গ্রীসবাসীরা অলিম্পিয়াতে জিউস দেবতার মন্দির প্রাঙ্গনে এক ধর্মীয় উৎসবে মিলিত হত। এখানে খেলাধূলা ছাড়াও কবিতা, নাটক, আবৃত্তি ও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত ছিল। গ্রীক রাজ্যগুলি পরস্পর যুদ্ধরত থাকলেও পাঁচদিনের এই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় যুদ্ধে সাময়িক বিরতি ঘোষণা করা হত। সারা গ্রীসে গ্রীকভাষা প্রচলিত থাকার সূত্রে গ্রীকদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যের বন্ধনও ছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীকদের উপনিবেশ স্থাপন: হোমারের যুগ থেকে গ্রীকরা ভূমধ্যসাগর, ইজিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য নতুন বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। নানাকারণে গ্রীকরা বিদেশে চলে যেত। গ্রীসের কাছেই ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর জুড়ে অসংখ্য দ্বীপের অবস্থিতি

গ্রীকদের সমুদ্রযাত্রায় প্রলুব্ধ করত। দেশত্যাগী গ্রীকদের মধ্যে দরিদ্র চাষী, কারিগর এবং ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল। বিভিন্ন গ্রীকরাজ্যের বিত্তবান ও বিত্তহীন মানুষের মধ্যে গৃহবিবাদ লেগেই থাকত। রাজ্যগুলির মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধও হত। তাই অনেক শান্তিকামী গ্রাকও দেশ ছেড়ে চলে যেত। এইসব দেশত্যাগী গ্রীকদের চেষ্টায় গ্রীসের মতই বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য নগররাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিদেশে অবস্থিত গ্রীক নগররাজ্যগুলি মাতৃভূমি গ্রীসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীসের সংস্কৃতি বিস্তারের ব্যাপারে এই নগররাজ্যগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

এথেন্স ও স্পার্টার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন—
এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ

এথেন্স ঃ গ্রীসের মধ্যভাগে পর্বতময়, অনুর্বর অ্যাটিকা অঞ্চলে এথেন্স নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ইজিয়ান সাগরে অবস্থিত অ্যাটিকার উপকূল জলপথে বাণিজ্যের পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এথেন্স খুবই উন্নতিলাভ করে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে এথেন্স রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছিল।

এথেন্সের অধিবাসীরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ— (ক) বংশানুক্রমে অভিজাতশ্রেণী (খ) ডিমস্ বা সাধারণ লোক। এই শ্রেণীতে চাষী, কারিগর, বণিক, মহাজন প্রভৃতি নানাধরণের লোক ছিল। (গ) মেটিক্স অর্থাৎ এথেন্সে বসবাসকারী বিদেশীরা (ঘ) দাস অর্থাৎ সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষ। গ্রীকরা মনে করত যে দাসরা হচ্ছে প্রাণবিশিষ্ট যন্ত্র—এরা মানুষ নয়।

এথেন্সের উত্থানের প্রথমদিকে প্রাচীন অভিজাতশ্রেণী সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম

শতকে পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেন্সের ডিমস্ বা সাধারণ মানুষ পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে। তবে এথেন্সের গণতন্ত্রে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি ছিল। মেটিক্স অর্থাৎ বিদেশী নাগরিক ও নারীদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। দাসদের কোনরকম অধিকার ছিল না। দাসদের বেগার শ্রমেই এথেন্সের আর্থিক উন্নতি গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই ছিল দাস। দাসপ্রথা এথেনীয় গণতন্ত্রের এক বড় কলঙ্ক।

স্পার্টা ঃ গ্রীসের দক্ষিণে পেলোপন্নেসাস্ অঞ্চলে স্পার্টা নগররাষ্ট্র অবস্থিত ছিল। বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এথেন্সের চরম উন্নতির যুগে স্পার্টা গ্রীসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক রাষ্ট্ররূপে গণ্য হয়েছিল।

স্পার্টার জনসংখ্যা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(ক) বিজয়ী আর্যরা, যারা 'স্পার্টান' নামে পরিচিত। (খ) 'পেরিয়কি' নামে পরিচিত বিজিত প্রাচীন অধিবাসী, যাদের স্পার্টানরা দাসত্বের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল। এরা ব্যবসা ও শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিল। (গ) 'হেলট্' বা দাসের দল। এরা স্পার্টানদের জমিতে বেগার খাটত। অন্যান্য দেশের দাসদের মতই হেলট্দের কোন মানবিক অধিকার ছিল না।

লোকসংখ্যার শতকরা দশভাগ মাত্র ছিল স্পার্টান এবং এরাই সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ও ভূসম্পত্তির মালিক ছিল। অস্ত্রধারণ ও সৈন্যদলে যোগদানের অধিকার শুধুমাত্র স্পার্টানদেরই ছিল। দাসত্ব ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য হেলট্রা বারবার বিদ্রোহ করত। দাসবিদ্রোহ দমনের জন্য স্পার্টানরা এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছিল। যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জন করে রণক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করাই ছিল স্পার্টানদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শিল্প-বাণিজ্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির কোন চেষ্টাই স্পার্টানরা করেনি।

রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে স্পার্টার শাসন-ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল। তবে শাসনকার্যে অভিজাতদের ক্ষমতাই বেশী ছিল।

এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ ঃ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষে এথেন্স ও স্পার্টা পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধের কতগুলি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে এথেন্সের সাফল্যকে স্পার্টা ঈর্ষার চোখে দেখত। দ্বিতীয়ত, স্পার্টার অভিজাতরা এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ভয়ের চোখে দেখত। তারা মনে করত যে স্পার্টার পদানত মানুষ গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যেকোন মুহূর্তে অভিজাতদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে। তাই তারা এথেন্সকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ক্ষমতাশালী এথেন্স বিভিন্ন গ্রীক রাজ্যগুলির উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে স্পার্টা গ্রীকরাজ্যগুলিকে সমর্থন করে। এইভাবে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় সব গ্রীক রাজ্যই জড়িয়ে পড়েছিল। ত্রিশ বছর যুদ্ধের পর সমস্ত গ্রীক রাজ্যগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রীসের গৌরবের যুগ শেষ হয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক জগতে এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব—সাহিত্য, শিল্পকলা ও ধর্মে উন্নতি—কয়েকজন বিশিষ্ট মহান এথেনীয়

এথেন্স হল প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পীঠস্থান। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে, বিশেষ করে পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সের সাংস্কৃতিক গৌরব চরম শীর্ষে আরোহণ করে। গ্রীসের খ্যাতনামা লেখক, শিল্পী এবং দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন এথেন্সের নাগরিক। অনেকে এখানে তাঁদের গৌরবময় কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক থুকিদিদিস, ভাস্কর ফিডিয়াস, নাট্যকার এস্কিলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস এবং অ্যারিস্টো-

ফেনিস, দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিষ্টোটলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এথেন্সের উচ্চভূমিতে (অ্যাক্রোপোলিস —প্রত্যেক গ্রীক শহরেই একটি উচ্চভূমি তৈরী করা হত)



পসিডন



আর্টেমিস

প্রতিষ্ঠিত পার্থেনন মন্দির একাধারে গ্রীক শিল্পকলা ও ধর্মের সার্থক নিদর্শন। খ্যাতনামা ভাস্কর ফিডিয়াস, স্থপতি ইক্‌টিনাস, চিত্রকর পলিগ্নোটাস ও প্যারাসিয়াসের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটি গ্রীক শিল্পকর্মের সার্থক প্রতীকে পরিণত হয়। পার্থেনন মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ অনেক চিত্র গ্রীসের ধর্ম ও পুরাকাহিনী অবলম্বনে রচিত। একটি চিত্রে দেবী এথেনা ও সমুদ্রদেবতা পসিডন এথেন্স-বাসীদের ভালবাসা অর্জনের চেষ্টায় রত। প্রাচীন গ্রীকধর্মে দেবতা ও মানুষের সম্পর্ক যে কত নিবিড় বলে ভাবা হত এই চিত্রটিতে তা ফুটে উঠেছে।



এথেনা

প্রাচীন গ্রীসের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি

পেরিক্লিসঃ ইনি ছিলেন এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, বাগ্মী এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। দীর্ঘকাল ধরে তিনি এথেন্স রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে এথেন্সের ডিমস্ অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছিল। তাঁর সময়ে এথেন্সে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। এঁদের মধ্যে দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস, ভাস্কর ফিডিয়াস ও নাট্যকার ইউরিপিডিস অন্যতম। পেরিক্লিস গর্ব করে বলেছিলেন যে, এথেন্স হচ্ছে গোটা গ্রীসের বিদ্যালয়।


পেরিক্লিস

সোফোক্লিস (খৃষ্টপূর্ব ৪৯৬—খৃষ্টপূর্ব ৪০৬): গ্রীসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। করুণ রসের নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর অনেক নাটকেই তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কোন মানুষই ভাগ্যের লিখন ও প্রতিহিংসা এড়াতে পারে না।

সক্রেটিস (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪৬৯—৩৯৯) : সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীসের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি বলতেন যে জ্ঞানচর্চার মধ্যেই মানুষের সুখের পথ নিহিত রয়েছে। এথেন্সের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এথেন্সে প্রচলিত বহু রীতিনীতির তিনি সমালোচনা করেন। ফলে এথেন্সের রাষ্ট্রনায়করা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন এবং তরুণচিত্তকে কলুষিত করার দায়ে সক্রেটিসকে

অভিযুক্ত করেন। সক্রেটিস বলিষ্ঠভাবে এই অভিযোগ খণ্ডন করেন। কিন্তু তাঁকে বিষপান করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। আজও সক্রেটিসকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের



সক্রেটিস

একজন রূপে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো সক্রেটিসের একজন যোগ্য শিষ্য।



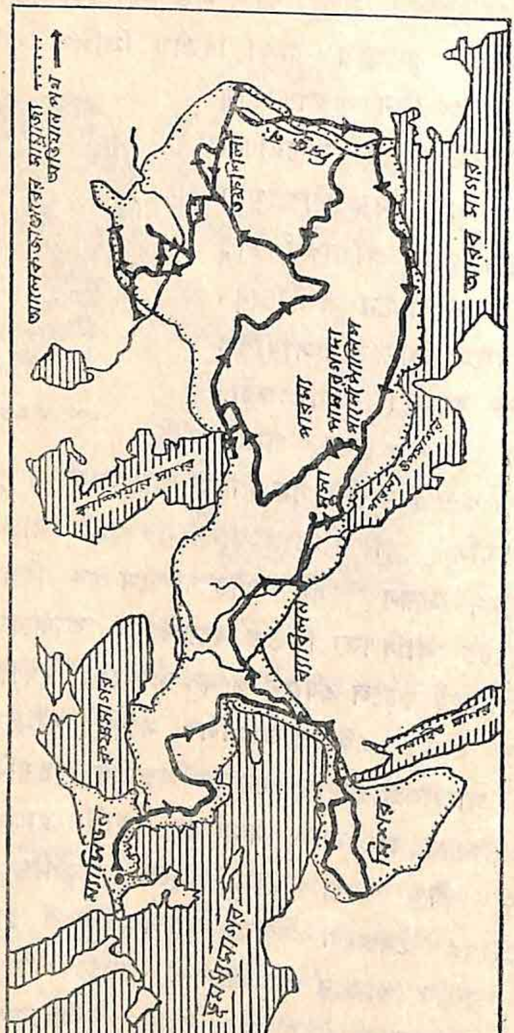
হেরোডোটাস

হেরোডোটাস ঃ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কোন দেশের সামাজিক রীতিনীতি গড়ে ওঠার ব্যাপারে সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর যথেষ্ট প্রভাব থাকে। হেরোডোটাসকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়।

ম্যাসিডন ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ঃ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষভাগ থেকে ক্রমাগত আত্মকলহের ফলে গ্রীকরাজ্যগুলি হীনবল হয়ে পড়েছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ দুর্বল গ্রীক রাজ্যগুলি জয় করে নেন। এরপর তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করেন। এই সময় তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার পিতার অসম্পূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্রতী হন। খৃষ্টপূর্ব ৩৩৪ সালে তিনি তাঁর সামরিক অভিযান শুরু করেন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে দুর্বল পারস্য সাম্রাজ্য জয় করতে কুশলী সমরনায়ক আলেকজাণ্ডারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পারস্য সাম্রাজ্য দখলের সূত্রে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিমে এক বিরাট অঞ্চলে পারস্য সম্রাটের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। কালক্রমে পারস্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট ভারতীয় রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্যের ফলে প্রথমদিকে আলেকজাণ্ডারের কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী ছোট রাজ্যের রাজা পুরু তাঁকে তীব্র বাধা দেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলেও আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল আর অগ্রসর হতে চাইল না। উনিশ মাস ভারতে থাকার পর স্বদেশে ফেরার পথে ব্যাবিলন শহরে তাঁর মৃত্যু হয় (খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ সাল)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক-অধিকৃত অঞ্চলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব অধিকার করতে সক্ষম হন। এইভাবে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।



আলেকজাণ্ডার


আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য
অভিযান পথ
কাস্পিয়ান সাগর
পারস্য
পাসারগাদা
পার্সেপোলিস
সুসা
ব্যাবিলন
পারস্য উপসাগর
আরব সাগর
লোহিত সাগর
মিশর
কৃষ্ণসাগর
ম্যাসিডন
ভূমধ্যসাগর

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পতন—রোমের গ্রীস বিজয়ঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সেনাপতি টলেমী মিশরের অধিপতি হন। সেনাপতি সেলুকাস পশ্চিম এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন। সেনাপতি আন্তিগোনাস গোনাতাস ম্যাসিডন, গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল দখল করেন। এঁদের রাজত্বকালেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রীকদের হস্তচ্যুত হয়েছিল। এসব ঘটনা মনে রাখলে মনে হতে পারে যে আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানের কোন দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল নেই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের বিজয়াভিযানের বিশেষ কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব না থাকলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অভিযান এক দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করে। মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজ্যগুলির মাধ্যমে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপেও প্রাচ্য ভাবধারা প্রসার লাভ করে। প্রাচ্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এশিয়া মাইনরের কাছে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত আন্টিয়োক্ এবং মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর গ্রীক সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়। গ্রীসের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অবসান হলেও সাংস্কৃতিক গৌরব অব্যাহত থাকে। টলেমী রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গণিতজ্ঞ ইউক্লিড, আর্কিমিডিস ও অ্যাপোলোনিয়াস, জ্যোতির্বিদ অ্যারিষ্টার্কাস, ইরাটোস্থেনিস, হিপার্কাস এবং যন্ত্রবিদ্ ষ্টেসিবিয়াসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গ্রীক রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে রোম খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যে মূল গ্রীস ভূখণ্ড এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন গ্রীক রাজ্যগুলি দখল করে, কালক্রমে বিজয়ী রোমানরা বিজিত গ্রীকদের মহান সভ্যতার যোগ্য উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়েছিল।

রোম

রোম শহরের উৎপত্তিঃ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সালের পর থেকে আর্যজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী ইটালীতে প্রবেশ করতে থাকে। ল্যাটিন নামে এক আর্যগোষ্ঠী টাইবার নদীর মোহানায় বসতিস্থাপন করেছিল। এটি ছিল বিভিন্ন বাণিজ্যপথের সঙ্গমস্থল। এখানে পাহাড়ঘেরা এক জায়গায় তারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। ধীরে ধীরে এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই অঞ্চলটি একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। এইভাবে প্রায় ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে রোম শহরের সূচনা হয়। ৫০৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমের অভিজাতরা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

রোম—কার্থেজ সংঘর্ষঃ কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধের সূত্রে রোম রাজ্যবিস্তার করতে আরম্ভ করে। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত কার্থেজ শহর সে যুগে বাণিজ্যের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। কার্থেজ ইটালীর দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করলে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। খৃষ্টপূর্ব ২৬৪ সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৪৬ সালের মধ্যে রোম ও কার্থেজ তিনবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপতি হানিবলের অপূর্ব বীরত্ব ও সমরকৌশল ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তৃতীয় যুদ্ধে রোম জয়লাভ করে কার্থেজ শহরকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। কার্থেজের পরাজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমের আর কোন শত্রু রইল না। এবার থেকে রোম রাজ্যবিস্তারের পথে পা দিল। এরপর ম্যাসিডন, গ্রীস ও সিরিয়া সহজেই রোমের দখলে আসে।

প্রথম যুগে রোমের সমাজ—প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, রোমান নাগরিকত্বঃ রোম শহরের প্রাচীন অধিবাসীরা নিজেদের 'প্যাট্রিসিয়ান' বলে পরিচয় দিত। ল্যাটিন ভাষায় 'প্যাটার' শব্দের

অর্থ 'পিতা'। কালক্রমে প্যাট্রিসিয়ানরা এক বংশানুক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। রোমের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তি এদের দখলে ছিল।

রোমের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকে রোমে বসবাস করতে এসেছিল। এছাড়া প্যাট্রিসিয়ানরাও রোমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করে বিজিত প্রজাদের অনেককে রোমে বাস করতে বাধ্য করেছিল। বিজিত অঞ্চলের ভালো জমিগুলি প্যাট্রিসিয়ানরা নিজেরাই দখল করে নিত। নতুন অধিবাসীরা 'প্লিবিয়ান' নামে পরিচিত হল। প্লিবিয়ানদের অধিকাংশই ছিল ছোট ছোট চাষী ও কারিগরশ্রেণীর লোক। কালক্রমে এদের মধ্যে কিছু লোক ব্যবসা ও সমুদ্রপথে মাল পরিবহণের সূত্রে বিত্তশালী বণিক ও জাহাজমালিক হয়েছিল। প্লিবিয়ানরা সরকারকে কর দিত এবং প্রয়োজনমত দেশের জন্য যুদ্ধ করত। কিন্তু কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা এদের ছিল না। প্রায় দুশ বছর আন্দোলন করে প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ানদের সমান রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু দুদলের মধ্যে অসাম্য কমল না। কারণ সরকারী কর্মচারীদের বিনা বেতনে কাজ করতে হত বলে একমাত্র প্যাট্রিসিয়ান ও ধনী প্লিবিয়ানরাই সরকারী পদে যোগদান করত। এছাড়া, রোম কোন প্রতিবেশী রাজ্য জয় করলে প্যাট্রিসিয়ানরা বিজিত রাজ্যের ভূ-সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ নিজেরা আত্মসাৎ করত।

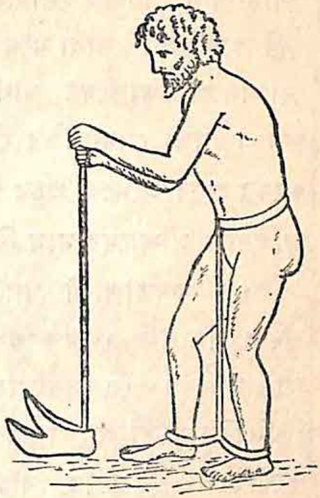
রোমান নাগরিকত্ব ঃ ইটালীতে রাজ্যবিস্তারের সময় রোম বিজিত রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছিল। রোমের এই সদয় ব্যবহারের ফলে কালক্রমে গোটা ইটালীতে রোমের প্রতি এক আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়। ইটালীবাসী প্রাক্তন শত্রুদের রোমানরা তিনভাগে ভাগ করেছিল। (ক) প্রকৃত রোমান নাগরিক। এদের মধ্যে যারা রোমের কাছে থাকত তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ছিল। কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের

ল্যাটিন শহরগুলির লোকদের ভোটদানের কিম্বা কোন সরকারী পদলাভের সুযোগ ছিল না। (খ) ল্যাটিন গোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে জড়িত গোষ্ঠীগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করত। (গ) ইটালীতে রোমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য মিত্র গোষ্ঠী। যুদ্ধের সময় এরা সৈন্য দিয়ে রোমকে সাহায্য করত। এদের রোমের বৈদেশিক নীতিকে মেনে চলতে হত।

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে রোমান রাজ্য ইটালীর বাইরে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোমানরা কখনও পদানত জাতিগুলির ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি। অধিকাংশ অঞ্চলেই স্বায়ত্তশাসনের বন্দোবস্ত ছিল। দাস ছাড়া অন্যান্য স্বাধীন লোকদের রোমের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাই রোমের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাদের মধ্যে এক ঐক্যবোধ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোমের রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমের প্রভাবশালী অভিজাতশ্রেণী ও দাসমালিকরা আর্থিক সমৃদ্ধির একচেটিয়া অধিকারী হয়েছিল। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যবৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের প্রতি গরীব রোমান নাগরিকদের আনুগত্য ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়েছিল।

দাসত্ব ও দাসবিদ্রোহ (স্পার্টাকাস) ঃ কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে রোম বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল। এই রাজ্যবিস্তারের সূত্রে রোমে দাসপ্রথা বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে গ্রীসের মত রোমেও কৃষিকর্ম ও শিল্প উৎপাদনে দাসদের ব্যবহার স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ইটালী ও রোমান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিজাতদের বিশাল জমিদারীতে দাসদের বেগার খাটান হত। খনি ও কারখানাগুলিতে কাজ করার জন্যও অসংখ্য দাস নিযুক্ত হত। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে দাসপ্রথার সূচনা হয়েছিল এবং এই নিষ্ঠুর প্রথা রোমান সাম্রাজ্যে চরম বিকাশ লাভ করে। দাসদের কায়িক পরিশ্রমই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উৎপাদনব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। রোমান প্রভুদের চোখে দাসরা

ছিল জড় পদার্থ, সম্পদবৃদ্ধির উপযুক্ত হাতিয়ারমাত্র। রোমের স্বাধীন নাগরিকদের আনন্দবর্ধনের জন্য হতভাগ্য দাসদের সার্কাস, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হত। নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে তিলে-তিলে মৃত্যুবরণ করাই ছিল দাসজীবনের সাধারণ নিয়ম। রোমান প্রভুদের নির্মম শোষণ ও অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাসরা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল।



রোমান দাস

খৃষ্টপূর্ব ৭৩ সালে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহের ঘটনা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ইটালীর কাপুয়া শহরে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। কালক্রমে রোমের অধীন বিভিন্ন জাতির প্রায় লক্ষাধিক দাস এই বিদ্রোহে যোগদান করে। দুবছর ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল। সাফল্যের মুহূর্তে বিদ্রোহীদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে স্পার্টাকাসকে পরাজয় বরণ করতে হয়। বিদ্রোহ দমনের জন্য রোমান অভিজাতদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য আমদানী করতে হয়েছিল। ক্ষিপ্ত অভিজাতশ্রেণীর নির্দেশে কাপুয়া থেকে রোম পর্যন্ত পথে পথে বিদ্রোহী দাসদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। বীর স্পার্টাকাসের নামানুসারে এই বিদ্রোহ 'স্পার্টাকাস বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

'স্পার্টাকাস বিদ্রোহ' ব্যর্থ হলেও দাসদের বিদ্রোহী মনোভাবে কোন ভাঁটা পড়েনি। আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে দাসরা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে গলদেশে যে দাসবিদ্রোহ দেখা দেয় কালক্রমে তা স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘকালব্যাপী এই বিদ্রোহে স্বাধীন অথচ নিঃস্ব চাষীরাও অংশগ্রহণ করেছিল।

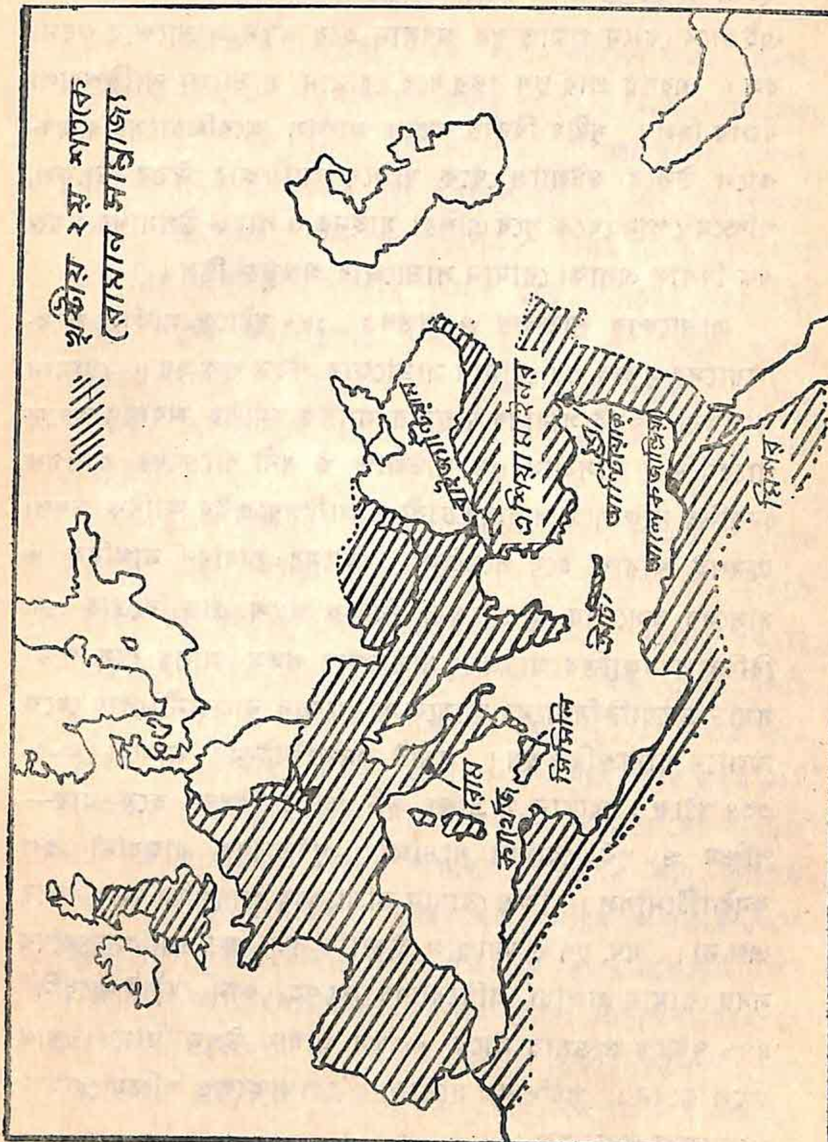
জুলিয়াস সীজার—রোমে প্রজাতন্ত্রের অবসান—নতুন সাম্রাজ্য : স্পার্টাকাস বিদ্রোহ রোমান অভিজাতদের মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তারা মনে করল যে একমাত্র সুদক্ষ সেনানায়করাই রোমান অভিজাতদের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে। তখন রোমে ক্ষমতালোভী সেনাপতির কোন অভাব ছিল না। বিভিন্ন রাজ্য-জয়ের সূত্রে অনেকে প্রচুর ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে জুলিয়াস সীজারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক ক্ষমতাশালী প্যাট্রিসিয়ান পরিবারে সীজারের জন্ম হয়। সুদক্ষ সেনাপতি, লেখক ও বক্তা হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রোমের সাধারণ নাগরিকদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি বিনামূল্যে আমোদপ্রমোদের বন্দোবস্ত করেছিলেন। গরীব নাগরিকদের মধ্যে বিনামূল্যে অন্ন বিতরণের কথাও তিনি বলেন। ইটালীর উত্তরে গলদেশ জয় করে তিনি সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন। বিজিত দেশের প্রচুর ধনরত্ন সৈন্যদের মধ্যে বিলি করে সীজার তাদের আনুগত্য লাভ করলেন। খৃষ্টপূর্ব ৪৯ সালে তিনি



জুলিয়াস সীজার

রোমে প্রবেশ করেন। রোমের গরীব নাগরিকরা তাঁকে সমর্থন করল। ফলে শত্রুদের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে সীজার দেশের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন (খৃষ্টপূর্ব ৪৯)। সীজার নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বিরোধীদলের চক্রান্তে খৃষ্টপূর্ব ৪৪ সালে তিনি আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। সীজারের মৃত্যুর পর রোমে আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হল। এই গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে সীজারের দত্তকপুত্র অক্টেভিয়ান খৃষ্টপূর্ব ২৭ সালে ক্ষমতা দখল করলেন। যদিও তিনি নিজেকে প্রজাতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকারী


খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে
রোমান সাম্রাজ্য
কৃষ্ণসাগর
ক্রীট
সিসিলি
রোম
কার্থেজ
মিশর

বলে প্রচার করতেন, আসলে তাঁর সময় থেকেই রোমে সম্রাটপদের সূচনা হল। তিনি সম্রাট অগাষ্টাস নামে পরিচিত হলেন। এইভাবে রোমে প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়ে নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা হল। এরপর প্রায় দুশ বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মার্কাস অরেলিয়াসের রাজত্ব-কালে উত্তরে স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে আফ্রিকার উত্তর উপকূল, পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে এশিয়া মাইনর ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় ও পতনঃ ১৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কাস অরে-লিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। রোমান শাসকরা কখনই সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতির অবসান করতে পারেননি। দাসশ্রমে পুষ্ট অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের ক্রমাগত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাষী ও কারিগরশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়েছিল। রোমের সাধারণ নাগরিক ও দাসদের অসন্তোষ, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রজাবিদ্রোহ এবং বিভিন্ন বর্বরজাতির আক্রমণে সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়ে পড়ে। সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের আমলে সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে মিলানে স্থানান্তরিত হয়। সম্রাট কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইনের আমলে (৩০৬-৩৩৭ খৃষ্টাব্দ) রোমান সাম্রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য। পূর্বভাগের রাজধানী হল কন্‌ষ্ট্যাণ্টিনোপল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি আর ফিরে এল না। গথ, হূণ ও ভ্যাণ্ডাল ইত্যাদি বর্বর জাতির আক্রমণের সময় রোমান প্রজারা প্রতিরোধের বিশেষ কোন চেষ্টাই করেনি। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ওডেসার নামে একজন জার্মান উপজাতিনেতা রোম দখল করেন। পূর্বদিকের সাম্রাজ্য টিঁকে থাকলেও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল।

খৃষ্টধর্মের উত্থানঃ খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন যীশুখৃষ্ট। প্যালেষ্টাইনের বেথ্‌লেহেম শহরে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম

হয়। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে অতি অল্প বয়সেই তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। নীতিকথামূলক গল্প এবং অর্থবহ শ্লোকের সাহায্যে যুবক যীশু প্যালেষ্টাইনের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক নতুন আদর্শ প্রচার করেন। বিনয়, মানবসেবা, ও আত্মত্যাগ হল যীশুর মূল আদর্শ। প্যালেষ্টাইনের অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর বণিক ও মহাজন এবং ঐশ্বর্যলোলুপ ইহুদী পুরোহিতদের তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। যীশুর পবিত্র জীবনধারা ও বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তাঁর শিষ্য হল। যীশুর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তাঁর প্রভাবশালী শত্রুরা যীশুকে সমাজ ও রাষ্ট্রের শত্রু বলে বর্ণনা করল। রোমান শাসকের বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

মৃত্যুকালে যীশু কোন লিখিত উপদেশ রেখে যাননি। যীশুর মৃত্যুতে তাঁর শিষ্যরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এইভাবে যীশুর মতবাদ মানুষের মন থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার যুগে খৃষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তখন রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। আর্থিক দুর্গতির ফলে রোমের সাধারণ মানুষ ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। সবরকমের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত দাসের দল রোমান শাসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বর্বর জাতি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ক্রমাগত আক্রমণ করেছিল। রোমান শাসকদের মধ্যেও গভীর অনৈক্য দেখা দিয়েছিল। এই চরম বিশৃঙ্খলা ও হতাশার যুগে প্রচলিত ধর্মমতের উপর সাধারণ মানুষের কোন বিশ্বাস ছিল না। এই নৈরাশ্যময় পরিবেশে যীশুর জীবন ও বাণী সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনীর প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়েছিল। দরিদ্র, নিপীড়িত জনগণের

কল্যাণের জন্য যীশুর আত্মদান, ক্রুশবন্ধনের পর তাঁর পুনরুত্থান এবং যীশুর আশ্রয়ে পরলোকে অমরত্বলাভের সম্ভাবনার নানা কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রসার ক্রমেই বেড়ে যায়। প্রথমদিকে রোমান শাসকদের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও কালক্রমে তারাও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ক্রমাগত দাস ও প্রজাবিদ্রোহ এবং বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে শাসকশ্রেণীর মনেও গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। খৃষ্টধর্ম সাধারণ মানুষকে সহিষ্ণু ও অনুগত হবার উপদেশ দিয়েছিল। তাই রোমান সম্রাট ও বিত্তশালী দাস-মালিকরা ভেবেছিলেন যে এই নতুন ধর্ম সাম্রাজ্যে প্রসারলাভ করলে জনগণ সম্রাট ও বিত্তবানদের প্রতি অনুগত হবে। তাই রোমান সম্রাট কন্‌ষ্ট্যান্টাইন খৃষ্টধর্মের মাধ্যমে জনগণের আনুগত্য লাভের চেষ্টা করলেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের উপর থেকে প্রচলিত সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হল। খৃষ্টানদের ধর্মীয় সংস্থা চার্চও জনগণকে সম্রাটের প্রতি অনুগত হবার উপদেশ দেয়। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম বলে ঘোষণা করা হয়। এতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পথ রুদ্ধ না হলেও খৃষ্টধর্ম প্রসারের পথ প্রশস্ত হল।

চীন

মহান শাং বংশ ঃ খৃষ্টপূর্ব আঠার শতকে শাং বংশের বীর তাং এই রাজবংশের সূচনা করেন। এই রাজবংশের রাজত্বকালের (খৃঃ পূ ১৭৬৬—খৃঃ পূ ১১২২) অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে শাং যুগের চীনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা দেয়। শাং বংশের রাজত্বকালেই প্রাচীন চীনা বর্ণমালা আধুনিক রূপ ধারণ করে। মৃৎশিল্প এবং তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহারে এ যুগের চীনা শিল্পীরা অপূর্ব নৈপুণ্যের

পরিচয় দিয়েছিল। এইসময় রেশমশিল্পের বিকাশ ঘটে। চীনের প্রাচীন সেচব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধনে শাং রাজারা সচেষ্ট ছিলেন।

শাং আমলে সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তারা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও স্থানীয় ব্যাপারে এরাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল।

কন্‌ফুসিয়াস্ ও তাঁর আদর্শ ঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে চীনে তীব্র রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার ফলে অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছিল। দেশকে এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষার জন্য কন্‌ফুসিয়াস তাঁর আদর্শ প্রচার করেছিলেন।



কন্‌ফুসিয়াস

চীনের প্রাচীন আদর্শের প্রতি কন্‌ফুসিয়াসের অসীম ভক্তি ছিল। তাই দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও মানুষের নৈতিক অধঃপতন রোধ করার জন্য তিনি প্রাচীন রীতিনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এই বিষয়ে তাঁর আদর্শ ছিল প্রাচীন চীনা কিংবদন্তীর রাজা ইয়াও ও তাঁর উত্তরাধিকারী সুন্। প্রত্যেক প্রজা যাতে পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয় তার প্রতি এই রাজাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কন্‌ফুসিয়াসের মতে পরস্পরের প্রতি সহজাত ভালোবাসা ও সহানুভূতিই সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই মানুষের এই সহজাত গুণগুলির বিকাশ ঘটে। তাই কনফুসিয়াস্ পারিবারিক বন্ধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কন্‌ফুসিয়াসের মতে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির স্ফুরণের আরেকটি বড় উপায় হল প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা। তাঁর মতে, মানুষের মনে দয়া ও

নিষ্ঠা জাগিয়ে তোলাই হল শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন যে সব মানুষই সমান ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় এবং পরবর্তীকালে শিক্ষাই তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের সূচনা করে। তিনি মনে করতেন না যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী জন্মসূত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কন্‌ফুসিয়াস্‌ আশা করেছিলেন যে চীনের অজস্র রাজার মধ্যে কেউ না কেউ তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদর্শ গ্রহণের জন্য তিনি অনেক রাজাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা বাস্তবে পরিণত হয়নি।

চীনের 'বড় প্রাচীরে'র নির্মাণ কার্য : প্রাচীনকাল থেকে মধ্য-এশিয়ার বহু যাযাবর জাতি চীনের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে চীনের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি আক্রমণ করত। এদের মধ্যে দুর্ধর্ষ হূণদের আক্রমণ চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিল। চীনের উত্তরাঞ্চলের ছোট ছোট রাজারা এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অনেকগুলি প্রাচীর ও দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এইভাবে চীনের 'বড় প্রাচীর' নির্মাণের সূচনা হয়। চীনে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠিত হলে সুপরিকল্পিতভাবে প্রাচীর নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়।


চীনের বড় প্রাচীর

চিন্‌ বংশের প্রথম সম্রাট সি হুয়াং তি-র আমলে এই প্রাচীর চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পূর্বে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পাথর, ইট ও মাটি দিয়ে তৈরী এই প্রাচীরটি ২৫ ফুট উচু এবং ১৫ ফুট চওড়া। সি হুয়াং তি প্রায় কুড়ি লক্ষ লোককে এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল

দাস। তাঁর মৃত্যুর পরও প্রাচীরের নির্মাণকার্য চলেছিল। প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার লম্বা এই প্রাচীর চীনের 'বড় প্রাচীর' নামে পরিচিত। মিশরের পিরামিডগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন দাসদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তেমনি চীনের এই প্রাচীর নির্মাণের ক্ষেত্রেও দাসদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

চিন্ সাম্রাজ্য (খৃষ্টপূর্ব ২৪৬—খৃষ্টপূর্ব ২০৬) ঃ চিন্ রাজবংশের সময় চীনের দীর্ঘকালের অরাজকতার অবসান ঘটে। এই বংশের প্রথম সম্রাট সি হুয়াং তি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। প্রচলিত বিভিন্ন আইন, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ব্যবস্থা চালু করেন। লিখিত ভাষার সংস্কারের চেষ্টাও তিনি করেন। অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করে তিনি সারাদেশে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে প্রাচীন সবকিছুই দেশের উন্নতি রোধ করবে। এই কারণে তিনি কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ দেশ থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করেন। কন্‌ফুসিয়াসের লেখাগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়, কন্‌ফুসিয়াস ভক্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, প্রায় চারশ পণ্ডিতব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর কন্‌ফুসীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটে।

সি হুয়াং তি-র চেষ্টায় চীনের বড় প্রাচীরের নির্মাণকার্য দ্রুততর হয়েছিল। চীনকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর (খৃষ্টপূর্ব ২১০ সাল) চার বছরের মধ্যেই সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং চিন্ রাজবংশের পতন ঘটে।

ভারতবর্ষ

আর্যদের ভারতে আগমন ঃ কখন এবং কোন দেশ থেকে আর্যরা ভারতে এসেছিল সেটা আজও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সালের পর থেকে আর্যরা ভারতে আসতে শুরু করে। সম্ভবত আর্যরা কাস্পিয়ান সাগর ও দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ ভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করত। মনে হয়, উপযুক্ত পশুচারণক্ষেত্রের সন্ধানে আর্যরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমে ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একসঙ্গে একই সময়ে তারা দেশত্যাগ করেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠী ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে বসতিস্থাপনের সময় আর্যদের ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পরাজিত শত্রুদের আর্যরা 'দাস', 'দস্যু' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছিল।

বেদ: বেদ হল ভারতে আগত আর্যদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য। বেদ চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। এই চারিটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋক্ বেদ। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ সালে ঋক্ বেদ রচিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সালের মধ্যে পরবর্তী বেদগুলি রচিত হয়েছিল। বেদের রচনা কালকে 'বৈদিক যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

'বেদ' শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান'। এই শব্দের উদ্ভব হয়েছে 'বিদ্' ধাতু থেকে, যার অর্থ হল 'জানা'। বেদগুলিতে সেযুগের আর্যদের ধর্ম, দর্শনচিন্তা, পূজাপদ্ধতি ও যাদুবিদ্যার এক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এই গ্রন্থগুলিতে মূর্তিপূজা ও মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। এগুলি থেকে এদেশে আর্যদের প্রথম যুগের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

বেদের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম যুগের আর্যদের সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক সংগঠন

সমাজ: ভারতে বসবাসের প্রথম যুগে আর্যরা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা 'জনে' বিভক্ত ছিল। ঋক্‌বেদে ২৭৫টি জায়গায় 'জন' কথাটির

উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি পরিবার মিলে একটি 'জন' গঠিত হত। পরিবারের প্রধান ছিলেন পিতা। ঋক্ বেদের যুগে সমাজে নারীরা যথেষ্ট সম্মান পেতেন। কিন্তু ঋক্ বেদের কোথাও কন্যাসন্তান কামনা করে স্তোত্র নেই। অবশ্য ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আর্যদের পক্ষে পুত্রসন্তান কামনা করাই স্বাভাবিক ছিল। বেদবর্ণিত আর্যভারতে দুটি বর্ণ ছিল—আর্যবর্ণ ও দাসবর্ণ বা অনার্য। আর্যরা ছিল দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি ও উন্নতনাসা। অনার্য দাসরা ছিল কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ও অনুন্নত নাসা। কালক্রমে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মেলামেশা এবং নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আর্যসমাজ চারটি বর্ণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বর্ণভেদের মূল ভিত্তি হল পেশা। জ্ঞানচর্চা ও গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য দেবদেবীর উপাসনায় যারা রত, তারা হল ব্রাহ্মণ। গোষ্ঠীর স্বার্থে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসনে যারা লিপ্ত, তারা হল ক্ষত্রিয়। কৃষি, পশুপালন, শিল্পকর্ম ও বাণিজ্যের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা হল বৈশ্য। সমাজের একেবারে নীচুতলায় অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীতে স্থান পেল শূদ্ররা। এরা প্রধানত পরাজিত অনার্য। প্রথম তিন বর্ণের লোকদের সেবা ও সবচেয়ে শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত থাকাই হল এদের দায়িত্ব। অবশ্য ঋক্ বেদের যুগে এই শ্রেণীভেদ খুব কঠোর ছিল না।

ধর্মজীবন ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির কার্যকারণ সম্বন্ধে আর্যদের কোন ধারণা ছিল না। তাই আর্যরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে তাঁদের উপাসনা করত। বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, আগুনের দেবতা অগ্নি, জলের দেবতা বরুণ, তরুলতার দেবতা সোম এবং প্রভাতের দেবী ঊষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের আর্যরা মূর্তিপূজা করত না। দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ এবং নানা আহার্য বস্তু ও পুষ্প উৎসর্গ করত। পূজাপদ্ধতি ছিল সহজ ও সরল। উপাসক নিজেই পূজার্চনা সম্পাদন করত। ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের যুগ তখনও শুরু হয়নি।

রাজনৈতিক সংগঠন : গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন রাজা এবং খুব সম্ভবত রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক। অবশ্য রাজা অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। ঋক্ বেদে সভা, সমিতি, গণ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত পরিবারের প্রধান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে এগুলি গঠিত হত। রাজা এগুলির সমর্থনলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। প্রথম যুগে আর্যরা নির্দিষ্ট কোন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা দ্রুত ধাবমান বিজয়ী সৈন্যদলের মতই। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারের যুগে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় তারা পায়নি।

মহাকাব্য : মহাভারত ও রামায়ণ—আর্যদের এই তুটি মহা-কাব্য কালক্রমে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বলে পরিচিত হয়েছে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দশম শতক থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আর্যদের বীরত্বের নানা কাহিনী এই তুই মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে। গুপ্ত যুগে এই তুই গ্রন্থ বর্তমান আকার ধারণ করে।

মহাভারত পৃথিবীর দীর্ঘতম কাব্যগ্রন্থ। এতে রয়েছে এক লক্ষ শ্লোক। কবি ব্যাসদেব এর রচয়িতা। গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের মত এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস এর বিষয়বস্তু। সত্য ও ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী—এটি হচ্ছে মহাভারতের মূল কথা। মহাভারতের একটি অংশ গীতা নামে পরিচিত। প্রত্যেক মানুষেরই দায়িত্বপালনে যত্নশীল হওয়া উচিত এবং নিষ্কাম কর্মই মানবজীবনের লক্ষ্য—এটি হচ্ছে গীতার মর্মবাণী।

রামায়ণের রচয়িতা হলেন মহাকবি বাল্মিকী। মনে হয়, মহাভারতের পরবর্তী সময়ের ঘটনা নিয়ে রামায়ণ রচিত হয়েছে। রামের লঙ্কা জয়ের ঘটনা আর্যদের দক্ষিণভারতে প্রবেশের কথাই মনে করিয়ে দেয়। মহাভারতের যুগে এত বিস্তৃত অঞ্চলে আর্যরা রাজ্যবিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। রামায়ণকে গ্রীক মহাকাব্য ওডিসির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রীকবীর ইউলিসিসের মতই রাম তুঃসাহসিক অভিযানে ব্যস্ত। ইউলিসিসের পত্নী পেনি-

লোপির মত সীতাও স্বামীর প্রত্যাবর্তনের আশায় প্রতীক্ষারতা। রামায়ণে বর্ণিত রামের পিতৃভক্তি ও সীতার পতিপ্রেমের আদর্শ আজও হিন্দুদের পরম সমাদরের বস্তু।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঃ বৈদিক যুগের প্রথমে আর্যদের পূজাপদ্ধতি ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। কালক্রমে যাগযজ্ঞের রীতিনীতি জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। ধর্মীয় ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হয়ে যায়। বৈদিক যুগের শেষে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বণিক ও কারিগরশ্রেণীর আর্থিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়েছিল। সমাজে তাদের স্থান ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নীচে। তাই এই নতুন ক্ষমতাশালী শ্রেণীর মানুষরা বর্ণভেদের কঠোরতা ও ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। প্রচলিত বৈদিক প্রথাগুলি সম্পর্কে নানা চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। এই নতুন চিন্তার কিছুটা পরিচয় মেলে উপনিষদ গ্রন্থে। প্রচলিত বৈদিক ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়।


মহাবীর

জৈনধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন ক্ষত্রিয়বংশজাত মহাবীর (আঃ খৃষ্টপূর্ব ৫৪০—৪৬৭)। বেদ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি অস্বীকার করেছিলেন। মহাবীর বর্ণভেদপ্রথাকে অস্বীকার করেন নি। তবে একজন চণ্ডালও মানবিক গুণের অধিকারী হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। জৈনধর্মের মূলকথা হল অহিংসা।

উত্তর ভারতের কিছু অংশ, গাঙ্গেয় উপত্যকা, পশ্চিম ভারত এবং দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক অঞ্চলে জৈনধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। প্রধানত ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাবীর সংস্কৃতের পরিবর্তে বহুলপ্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন।



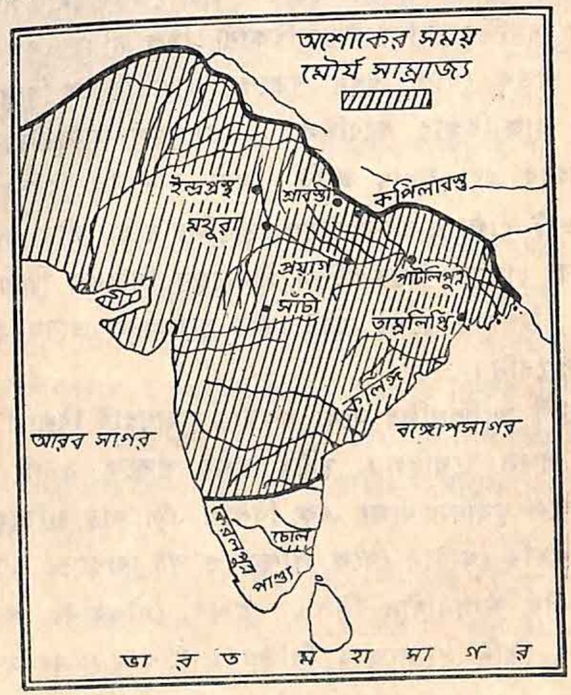
বুদ্ধদেব

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধও ছিলেন ক্ষত্রিয়বংশজাত (আঃ খৃষ্টপূর্ব ৫৬৩—৪৮৩)। বেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বর্ণভেদ, কোনটিকেই বুদ্ধদেব মানতেন না। সংস্কৃতের পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য পালি ভাষায় ধর্মপ্রচারের ফলে বুদ্ধের ধর্ম বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। যেকোন বর্ণের মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারত। তবে বিত্তশালী শ্রেণীর সুবিধার জন্য দাস ও ঋণী ব্যক্তিরা বৌদ্ধ সংঘগুলিতে যোগদানের অনুমতি পেত না। বুদ্ধদেব নারীদেরও সন্ন্যাস নেবার অধিকার দিয়েছিলেন। বৌদ্ধমঠগুলিতে যেকোন বর্ণের মানুষের শিক্ষালাভের সুযোগ থাকায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার হয়।

সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন—মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে কয়েকটি বৃহৎ রাজ্যের সূচনা হয়েছিল। এদের মধ্যে মগধ ছিল অন্যতম। কালক্রমে মৌর্যবংশের নেতৃত্বে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে মগধ ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। পূর্বভারতে নন্দরাজ ধননন্দের অত্যাচারে মগধের প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব ও মগধে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।



ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হলে আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুনদীর পশ্চিমাঞ্চল তাঁর হস্তগত হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার রাজ্য জয় করেছিলেন কিনা জানা

যায় না। পরবর্তী বিখ্যাত সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ভয়াবহ রক্তপাতে তাঁর মন বিচলিত হল। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে যুদ্ধের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে মন দিলেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের পথ রচিত হল। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অশোকই সর্বপ্রথম প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গ্রীস, পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ভাবধারা প্রসারিত হয়েছিল।

অশোকের মৃত্যুর (খৃষ্টপূর্ব ২২৭?) পর মৌর্যসাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙ্গে যায়। শুঙ্গ, কণ্ব এবং সাতবাহন নামে কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশ কিছুদিন রাজত্ব করলেও এরা কেউই মৌর্য সাম্রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। এরপর খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে প্রথম শতকের মধ্যে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারতে রাজ্যবিস্তার করেছিল। এরা হল ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক, শক, পহ্লব এবং কুষাণ জাতি। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য ও অজস্র উপজাতিগুলির মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের ফলে এরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে ভারতে আসে। উত্তর ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলি এদের প্রতিরোধ করতে পারেনি।

বিদেশী জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র কুষাণরাই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সফল হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে কুষাণসাম্রাজ্য এক বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার খোটান থেকে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর গুপ্ত নামে এক ভারতীয় রাজবংশের উত্থান হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে

গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যোদ্ধা ছাড়াও সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে ইতিহাসে বিখ্যাত। স্কন্দগুপ্ত (আঃ ৪৫৫—৪৬৭ খৃষ্টাব্দ) হলেন গুপ্তবংশের শেষ বিখ্যাত রাজা। মধ্য এশিয়ার বর্বর হূণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হূণজাতির আক্রমণ ও সাম্রাজ্যের সামন্তদের বিদ্রোহের ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন হয়।



সমুদ্রগুপ্ত

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর বিভিন্ন সময়ে বিশাল সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হলেও মৌর্যযুগের পরবর্তী সম্রাটরা চন্দ্রগুপ্ত কিম্বা অশোকের মত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তরাজারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

প্রাচীনকাল থেকে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—মোটামুটিভাবে এই দুই অঞ্চলের সাধারণ নাম হিসাবে বাংলাদেশ ও বাংলা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে)ঃ অতি প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। এক একটি গোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে এক একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। যেমন বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় নামে গোষ্ঠীর নামানুসারে বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় অঞ্চল।

ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে 'বঙ্গ' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গজনকে বগধদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় মগধকেই বগধ বলা হয়েছে। ঋষিরা জানতেন যে মগধের প্রতিবেশী দেশ হচ্ছে বঙ্গ। মহাভারত, রামায়ণ, সিংহলী মহাবংশ এবং প্রজ্ঞাপনা নামে এক জৈন উপাঙ্গে বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে।

গোষ্ঠীতন্ত্র ভেঙ্গে গিয়ে কখন থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রীক ও রোমান লেখকরা গঙ্গারিডা নামে এক রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেছেন যার রাজধানী হল গঙ্গে। কেউ কেউ মনে করেন যে গঙ্গে হল দক্ষিণ বাংলার বিখ্যাত গঙ্গাসাগর নগর এবং এটাই হল গঙ্গারিডা রাজ্যের রাজধানী। গ্রীক ও রোমান লেখকদের লেখা থেকে মনে হয় যে এখানে একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে বাংলার উত্তরাঞ্চলে মৌর্যক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুডনগল বা পুণ্ড্রনগর—বর্তমান বগুড়ার সন্নিকটে। মহাস্থানের শিলাখণ্ডলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় সোহগৌরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্র-লিপিটিতে এই ঘটনার সমর্থন রয়েছে।

গুপ্ত আমলে বাংলার বেশ কিছু অঞ্চল গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল। অনেকের ধারণা কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় সমুদ্রগুপ্তের বাংলাদেশে জয়যাত্রার ইঙ্গিত দেয়। তবে বাংলার সব-টাই তিনি জয় করতে পারেননি। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক একজন স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া গেছে। ইনি হলেন পুষ্করণার রাজা সিংহ-বর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা। বাঁকুড়ায় শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে এঁর লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এঁর রাজধানীর নাম পুষ্করণা নগরী। বাংলাদেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসে এঁরাই হলেন প্রথম স্বাধীন রাজা।

গুপ্ত আমলে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের সূত্রে বাংলাদেশেও শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে এই সমৃদ্ধি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও আর্থিক অবনতি দেখা দেয়। বাংলাদেশ ক্রমেই কৃষিনির্ভর দেশে পরিণত হয়। বাংলার এই আর্থিক অবনতির যুগে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ায় মহারাজ শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড় রাজ্যের সূচনা করেন।

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জনপদ নিয়ে গৌড় রাজ্য গঠিত হয়েছিল।

ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উপর বিদেশী যোগাযোগের প্রভাব (বিশেষত মধ্য এশিয়ার সঙ্গে)

মৌর্যবংশের পতনের পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দ্রুত পটপরিবর্তন হয়েছিল। ব্যাকৃট্রিয়ান গ্রীক, শক, পহ্লব এবং কুষাণ নামে বিভিন্ন জাতি মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে রাজ্যবিস্তার ও বসতি স্থাপন করেছিল। এদের মাধ্যমে রাজনীতি, ধর্ম ও বাণিজ্যের সূত্রে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে ভারতের সামাজিক ও বাণিজ্যিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতের সমাজ-জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ্যধর্মে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছিল। গৃহসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে জাতিভেদপ্রথার নিয়মকানুন কঠোর করা হয়। বৃত্তি বা পেশা পরিবর্তন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়া থেকে ব্যাকৃট্রিয়ান গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারতে আগমন ও রাজ্যবিস্তার এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করে। বিজয়ী বিদেশীদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণের ইচ্ছাকে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বাধা দিতে পারেনি। এই বিদেশী রাজ্যবিজেতাদের তারা উচ্চবর্ণে স্থান দিতে বাধ্য হল। তবে এদের 'পতিত' ক্ষত্রিয় আখ্যা দেওয়া হল—'পতিত' ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যারা শ্রেণীকর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, এরা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয়। ঠিক একইভাবে বিদেশীদের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয়রা সমাজে পূর্বাপেক্ষা উচুস্থান পেল। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হয়। এই আর্থিক উন্নতি ও পরিবর্তনের সুযোগে অনেক

নিম্নবর্ণের মানুষ অনেকসময় বাসস্থান ও পেশা পরিবর্তন করে তাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। একই বর্ণের মধ্যে নতুন নতুন উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীলতা এই সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে পারে নি।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত গ্রীক রাজ্যগুলির মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। কুষাণদের রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় বণিকদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কাশগড়, ইয়ারকন্দ্, খোটান, মিরাণ, কুচি, কারাশহর এবং তুর্ফানে ভারতীয়রা বাণিজ্যকেন্দ্র ও বসতিস্থাপন করেছিল। চীন ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যের সিংহভাগই ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ করত। বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের উন্নতির ফলে দেশে বণিক ও কারিগরদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনভুক্ত বণিক ও কারিগরদের স্বার্থরক্ষাই ছিল এগুলির উদ্দেশ্য। আর্থিক উন্নতির ফলে কুষাণ আমলে উত্তরভারতের শহরগুলি খুবই সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল।

ভারতে বিদেশী ভ্রমণকারী—মেগাস্থিনিস্ ও ফা-হিয়ানের বর্ণনায় ভারতের সমাজ ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পর থেকে রাজনীতি, ধর্ম ও বাণিজ্যের সূত্রে ভারতের সঙ্গে বহু দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বহু বিদেশী ভারত সম্পর্কে ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় এগুলি বিশেষ সাহায্য করে। ভারত সম্পর্কে বিদেশী বৃত্তান্তগুলির মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় প্রেরিত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' এবং গুপ্ত আমলে ভারত ভ্রমণরত চীনা বৌদ্ধ পর্যটক ফা-হিয়ানের 'বৌদ্ধরাজ্যসমূহের বিবৃতি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতে জাতিভেদপ্রথার উল্লেখ রয়েছে। তাঁর মতে, যার যা কাজ সেই অনুসারে ভারতীয়রা সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল—১. পণ্ডিত ও দার্শনিক ২. কৃষক ৩. পশুপালক

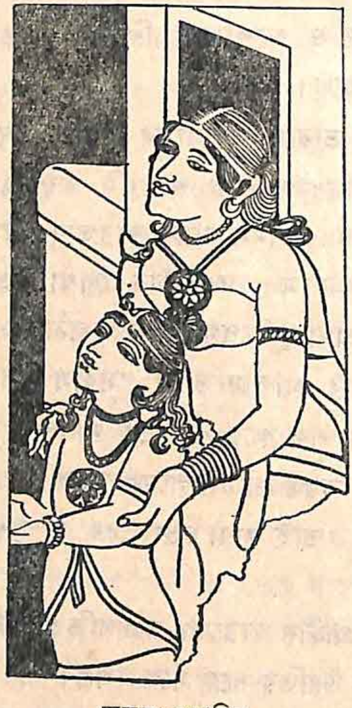
৪. ব্যবসায়ী ও কারিগর ৫. সৈনিক ৬. উপদর্শক বা গুপ্তচর এবং ৭. শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত রাজকর্মচারিবৃন্দ। মেগাস্থিনিস্-বর্ণিত শ্রেণীভেদের সঙ্গে কিন্তু প্রচলিত চারবর্ণের কোন মিল নেই। মেগাস্থিনিস্ লিখেছিলেন যে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং বর্ণগত পেশাও পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মতে এদেশে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল না। একথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অশোকের শিলালিপিতে দাসপ্রথার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

মেগাস্থিনিসের ভারতে অবস্থানের প্রায় সাতশ বছর পরে গুপ্ত-যুগে ফা-হিয়ান বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের জন্য এদেশে আসেন। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছুই লেখেন নি। তবে তাঁর লেখা পড়লে এটুকু বোঝা যায় যে জাতিভেদপ্রথা পূর্বাপেক্ষা অনেক কঠোর হয়েছিল। চণ্ডালরা লোকালয়ের বাইরে আলাদাভাবে বসবাস করত। লোকালয়ে ঢোকার সময় তারা শব্দ করে সবাইকে সাবধান করে দিত। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মনে করত যে চণ্ডালদের স্পর্শে তাদের দেহ অপবিত্র হয়ে যেতে পারে। তাই তারা চণ্ডালদের অস্পৃশ্য ও অশুচি বলে ঘৃণা করত।

বিভিন্নক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অগ্রগতি ঃ উন্নত রাজ্যশাসন-প্রণালী ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত বিস্ময়কর অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছিল।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঃ সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার যুগেই শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতা বিনষ্ট হলে ভারতের শিল্পজীবনের অগ্রগতি দীর্ঘ-কাল অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মৌর্যসম্রাট অশোকের চেষ্টায় ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ঘটে। বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য, বিহার ও অশোক-স্তম্ভগুলি নির্মাণের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পরীতি নব নব ধারায়

বিকশিত হয়ে ওঠে। মৌর্যোত্তর যুগে গান্ধার ও মথুরা শিল্পরীতির আবির্ভাব ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। গুপ্ত-যুগের অসংখ্য ভাস্কর্যকর্মের মধ্যে সারনাথের একটি বুদ্ধমূর্তি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জাতকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত অজন্তার গুহাচিত্রগুলি ভারতীয় চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন।



অজন্তা গুহাচিত্র

এগুলির অধিকাংশই গুপ্ত আমলে অঙ্কিত হয়েছিল। চিত্রকরদের অপূর্ব নৈপুণ্যে চিত্রগুলিকে জীবন্ত বলে মনে হয়। অনেকে অজন্তাকে 'এশীয় চিত্রকলার জন্মভূমি' বলে মনে করেন।

সাহিত্য ঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন হল বেদ। মহাভারত পৃথিবীর বৃহত্তম কাব্যগ্রন্থ। অসংখ্য বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য ছাড়াও লোকপ্রিয় সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ভারত বিস্ময়কর সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের

সাহিত্যকর্মের উজ্জ্বল প্রতীক হলেন মহাকবি কালিদাস। তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক বিশ্বসাহিত্যের এক পরম সম্পদ। এ-ছাড়া 'রঘুবংশ', 'কুমার সম্ভব' এবং 'মেঘদূত' কাব্যের জন্যও তিনি স্মরণীয়। 'পঞ্চতন্ত্র' নামে নীতিকথামূলক গল্পসঞ্চয়ন যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রূপকথাকে প্রভাবিত করেছে।

শিক্ষা : শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। বৈদিক যুগের ভারতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত। উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষায়তনগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠত। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। বৌদ্ধবিহারগুলি শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের অবসান হয়। বৌদ্ধরা সাধারণ মানুষের জন্যও শিক্ষায়তনের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র-গুলির মধ্যে তক্ষশিলা ও নালন্দার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হত। ধনুর্বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যায় তক্ষশিলা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রাচীন ভারতের খ্যাতনামা চিকিৎসক আত্রেয় এখানে অধ্যাপনা করেছিলেন। সুচিকিৎসক জীবক কোমারভচ্চ এখানকার ছাত্র ছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হল নালন্দা। গুপ্তরাজাদের বদান্যতায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পঠনপাঠনের উপযোগী পরিবেশ, কৃতী শিক্ষক ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের জন্য নালন্দার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র পাঠের জন্য স্থাপিত হলেও বেদ, হেতুবিদ্যা, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি বিষয়ও এখানে অধীত ও আলোচিত হত। নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও শীলভদ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকেও বহু ছাত্র নালন্দায় শিক্ষালাভের জন্য আসত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে নালন্দা খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।

বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতীয়রা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিল।

বৈদিকযুগে আর্যজীবনের এক প্রধান অঙ্গ ছিল ধর্ম। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি যথাসময়ে পালনের জন্য উপযুক্ত পঞ্জিকার প্রয়োজন। সঠিক পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্যই প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার সূচনা হয়। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেবতারূপে কল্পনা করলেও বৈদিক যুগের আর্যরা পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যভেদের চেষ্টা করেছিল। ঋক্ বেদের যুগেই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাদের অবস্থান ও গতিবিধি এবং ঋতু পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আর্যদের সঠিক ধারণা ছিল। গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিদ আর্যভটের নিরলস সাধনায় ভারতীয় জোতির্বিদ্যা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তিনি 'আর্যভটীয়' নামে বিখ্যাত পুস্তকের রচনাকার। আর্যভটের সমসাময়িক হলেন বরাহমিহির। তাঁর লেখা 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। গণিতের ক্ষেত্রেও এই দুই মনিষীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

গণিতের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হল দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যালিখন ও শূন্যের ব্যবহার। খুব সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে এই পদ্ধতিগুলির প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে আরবদের মাধ্যমে এগুলির ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জ্যামিতি, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতীয়রা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছিল। অথর্ব বেদে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয় আলোচিত হয়েছে। বেদোত্তর যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রকে বেদ থেকে পৃথক করে আয়ুর্বেদ রচিত হয়। এতে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা, শল্যবিদ্যা এবং বিভিন্ন রোগে ভেষজের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। আত্রেয়, পুনর্বসু, সুশ্রুত, জীবক, কোমারভচ্চ এবং চরক প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম।

কারিগরীবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূত্রে এদেশে রসায়ন শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। ওষুধে পারদ, লোহা এবং আর্সেনিকের ব্যবহার রসায়নশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিদ্‌দের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের চিহ্ন। খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশন ও খনিজ পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যবহারের উপযোগী করার ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কুতুব মিনারের পাশে গুপ্তযুগে নির্মিত মসৃণ লৌহস্তম্ভটি ধাতুবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার প্রয়োগকৌশলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুপ্তযুগের উন্নতমানের মুদ্রাগুলি রসায়নের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের উন্নতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুশ্রুত ও চরক, জৈব ও অজৈব যৌগিক সম্পর্কে বহু সারগর্ভ আলোচনা করেছিলেন।

অনুশীলনী

ক। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ ১। লৌহযুগের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিবরণ দাও। ২। ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সম্বন্ধে কি জান? ৩। ব্যাবিলনের সমাজব্যবস্থার পরিচয় দাও। ৪। ফ্যারাওদের শক্তিবৃদ্ধি ও পতনের ইতিহাস লেখ। ৫। পারস্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে কি জান? ৬। ইহুদীদের ভাগ্যবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে কি জান? ৭। বিভিন্ন স্বাধীন গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের মধ্যে কি কি কারণে ঐক্যবোধের সঞ্চার হয়েছিল? এই ঐক্যবোধ সত্ত্বেও কেন গ্রীসে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি? ৮। গ্রীকরা কেন বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করত?

৯। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে কি কি পার্থক্য ছিল? ১০। আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান সম্পর্কে কি জান? ১১। খৃষ্টধর্ম প্রসারের কারণগুলি কি? ১২। কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ সম্পর্কে কি জান? ১৩। সম্রাট সি হুয়াং তি সম্পর্কে কি জান? ১৪। বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্ম ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধে কি জান? ১৫। লৌহযুগের তিনজন ধর্মপ্রচারকের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কর। ১৬। প্রাচীন ভারতের বর্ণভেদ প্রথা সম্বন্ধে কি জান? ১৭। প্রাচীন ভারতের দুটি মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা কর। ১৮। কি পরিবেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল? ১৯। ভারতে বিদেশী জাতির আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। ২০। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে কি জান? ২১। ভারত ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতের সমাজব্যবস্থা ও বাণিজ্যে কি কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল? ২২। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়ান ভারত সম্পর্কে কি লিখেছিলেন? ২৩। শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অগ্রগতি সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। ২৪। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সম্পর্কে কি জান? ২৫। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ১। লৌহযুগ কাকে বলে? লৌহযুগের সূচনা-কাল সম্বন্ধে কি জান? ২। কারা ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু করেছিল? ৩। তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী জিনিসপত্র ব্যবহারের চেয়ে লোহার জিনিসপত্র ব্যবহারের বেশী সুবিধা কেন? ৪। লোহার প্রচলনের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি হয়েছিল কি? ৫। লৌহযুগে বণিক-মহাজনদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কেন? ৬। লৌহযুগে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে কি জান? ৭। কার রাজত্বকালে ব্যাবিলন শহরের খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছিল? ৮। ব্যাবিলনের আর্থিক উন্নতির জন্য হামুরাবি কি করেছিলেন? ৯। ব্যাবিলনের পুরোহিতদের সম্পর্কে তুমি কি জান? ১০। ব্যাবিলনে জ্যোতির্বিদ্যার প্রসারের কারণ কি? ১১। কোন্ সূত্র থেকে ব্যাবিলনের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়? ১২। হামুরাবির আইনবিধিকে তুমি সমর্থন করবে কি? যুক্তিসহ উত্তর লিখবে। ১৩। ফ্যারাও প্রথম আহ্‌মোস কি করেছিলেন? ১৪। আমন রা কে? ১৫। কার অধীনে প্রায় আট লক্ষ দাস কাজ করত? ১৬। চতুর্থ আমেনহোটেপ কি করতে চেয়েছিলেন? তিনি সফল হয়েছিলেন কি? ১৭। কোন্ পারস্য সম্রাট মিশর জয় করেন?

১৮। কাইরাস কে? তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? ১৯। কার রাজত্বকালে পারস্য ভারতের কিছু অংশ দখল করেছিল? ২০। কোন্ দেশ জয় করার চেষ্টায় দারিয়ুস ব্যর্থ হন? ২১। 'দারিক' কি? ২২। 'আভেস্তা-ই-জেন্দ্' কি? ২৩। জরথুস্ত্র কে? তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে কি জান? ২৪। মোজেস্ কে? ইহুদীদের উন্নতির জন্য তিনি কি করেছিলেন? ২৫। সল, ডেভিড ও সলোমন কে? ২৬। ক্রীট কোথায়? প্রাচীন ইজিয়ান সভ্যতা কারা গড়ে তুলেছিল? ২৭। ইলিয়াড ও ওডিসির লেখকের নাম কি? ২৮। হোমারের কাব্য দুটির নাম কি? এগুলিতে কোন্ সময়ের কথা লেখা আছে? ২৯। এথেনীয় গণতন্ত্রের দোষগুলি কি? ৩০। কি কারণে স্পার্টা খ্যাতি অর্জন করেছিল? ৩১। হেলট্‌দের সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৩২। স্পার্টানদের জীবনের মূল লক্ষ্য কি ছিল? তুমি কি স্পার্টানদের আদর্শ পছন্দ কর? ৩৩। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধের মূল কারণ কি? ৩৪। পার্থেনন মন্দিরটি কোথায়? এই মন্দিরের নির্মাণের সঙ্গে কোন্ কোন্ শিল্পী জড়িত ছিলেন? ৩৫। আলেকজাণ্ডার কোন্ দেশের রাজা? তিনি কেন ভারত আক্রমণ করেছিলেন? ৩৬। আলেকজাণ্ডারের প্রাচ্য অভিযানের দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৩৭। আলেকজান্দ্রিয়া কোথায়? এই শহরটি কিসের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল? ৩৮। আলেকজান্দ্রিয়ার সাংস্কৃতিক গৌরবের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন গ্রীক মনীষীর নাম কর। এঁরা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন? ৩৯। কিভাবে রোম শহরের সূচনা হয়? ৪০। কার্থেজ কোথায়? কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ হয়েছিল কেন? এই যুদ্ধের ফলে রোমের কি হয়েছিল? ৪১। 'প্যাট্রিসিয়ান' ও 'প্লিবিয়ান' কাদের বলা হত? ৪২। রোমে বারবার দাসবিদ্রোহ হত কেন? ৪৩। স্পার্টাকাস কে? তাঁর নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কেন? ৪৪। জুলিয়াস সীজার কে? তাঁর সাফল্যের কারণগুলি কি? ৪৫। রোমে সম্রাটপদের সূচনা কে করেছিলেন? ৪৬। কোন্ কোন্ বর্বর জাতি রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল? ৪৭। কার রাজত্বকালে রোমান সাম্রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়? এগুলি কি নামে পরিচিত হয়েছিল? ৪৮। কে রোম দখল করেছিলেন? ঘটনাটি কত সালে ঘটেছিল? ৪৯। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ কি? ৫০। কোন্ পরিবেশে খৃষ্টধর্মের প্রসার হয়? ৫১। কেন সাধারণ মানুষ খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল? ৫২। কি উদ্দেশ্যে রোমের শাসক-শ্রেণী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল? এদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কি? ৫৩। শাং বংশের রাজত্বকালে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চীন উন্নতিলাভ করেছিল?

৫৪। কন্‌ফুসিয়াস্ কোন সময়ের লোক? তাঁর সময়ে চীনের অবস্থা কেমন ছিল? ৫৫। চীনের উন্নতির জন্ত কন্‌ফুসিয়াস্ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন? ৫৬। শিক্ষা সম্পর্কে কন্‌ফুসিয়াস্ কি মত পোষণ করতেন? ৫৭। কারা চীনের 'বড় প্রাচীরের' নির্মাণকার্যের স্থচনা করেছিলেন? ৫৮। চীনের 'বড় প্রাচীর' নির্মাণের কি উদ্দেশ্য ছিল? ৫৯। সি হুয়াং তি কে? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান? ৬০। সি হুয়াং তি কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শের বিরোধী ছিলেন কেন? ৬১। কোন্ দেশ থেকে আর্যরা ভারতে এসেছিল? ৬২। কোন্ সময় থেকে আর্যরা ভারতে আসতে আরম্ভ করে? ৬৩। বেদ কি? ৬৪। বেদ কটি? এগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে কি জান? ৬৫। বেদে কি লেখা আছে? ৬৬। বর্ণভেদের উৎপত্তির কারণ কি? ৬৭। ভারতীয় আর্যদের বর্ণভেদপ্রথা সম্পর্কে তুমি কি জান? ৬৮। মহাভারত ও রামায়ণের সঙ্গে অন্ত কোন মহাকাব্যের মিল আছে কি? ৬৯। জৈনধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? এই ধর্ম কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল? ৭০। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি হয়েছিল কেন? ৭১। অশোকের রাজত্বকালের গুরুত্ব সম্পর্কে কি জান? ৭২। মৌর্যদের পতনের পর কোন্ কোন্ বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করেছিল? এরা কেন ভারত আক্রমণ করে? ৭৩। কণিষ্ক কে? তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন কতটুকু ছিল? তাঁর রাজত্বকালের গুরুত্ব কি? ৭৪। কি কি সূত্র থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জানা যায়? ৭৫। বাংলাদেশে যে মৌর্যক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোন প্রমাণ আছে কি? ৭৬। চন্দ্রবর্মা কে? তাঁর রাজধানীর নাম কি? ৭৭। গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আর্থিক উন্নতি হয়েছিল কেন? ৭৮। বাংলাদেশের আর্থিক অবনতির কারণ কি? ৭৯। শশাঙ্ক কে? তিনি কি করেছিলেন? ৮০। গুপ্তবংশের দুজন বিখ্যাত রাজার নাম কর। এঁদের খ্যাতির মূল কারণ কি? ৮১। 'পতিত ক্ষত্রিয়' কাদের বলা হত? কোন্ সময়ে এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল? ৮২। মধ্য এশিয়ার কোথায় ভারতীয় বণিকরা বাণিজ্যকেন্দ্র ও বসতি স্থাপন করেছিল? ৮৩। মেগাস্থিনিস্ ও ফা-হিয়ান কে? এঁদের লেখা বইগুলির নাম কর। ৮৪। কাকে 'এশীয় চিত্রকলার জন্মভূমি' বলে মনে করা হয়? ৮৫। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:—(ক) পেরিক্লিস (খ) সোফোক্লিস (গ) সক্রেটিস (ঘ) হেরোডোটাস (ঙ) মহাবীর (চ) বুদ্ধদেব (ছ) জীবক কোমারভচ্চ (জ) আর্যভট (ঝ) চরক। ৮৬। নিম্নলিখিত স্থানগুলির খ্যাতির কারণ নির্দেশ কর:—(ক) তক্ষশিলা (খ) নালন্দা (গ) সুসা, পাসারগাদা ও পার্সেপোলিস্।

গ। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ** সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

১। ——জাতির লোকরা সর্বপ্রথম লোহাকে আগুনে উত্তপ্ত করে যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজ শিখেছিল। (সুমেরীয়, মিশরীয়, আর্য, হিটাইট্)

২। —— পর থেকে ভারতে বসবাসকারী আর্যরা লোহা ব্যবহার করেছিল। (খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সালের, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের, খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ সালের)

৩। থিব্‌স্ শহরের প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন ——। (ফ্যারাও, ইখ্‌নাটন, আমন রা)

৪। সম্রাট —— নেতৃত্বে পারস্য একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। (কাইরাসের, দারিয়ুসের, ক্যাম্বিসেসের)

৫। ক্রীটের সভ্যতা —— সভ্যতা নামে পরিচিত। (মাইসেনা, নসস্, ইজিয়ান)

৬। গ্রীসের দুটি মহাকাব্যের নাম হল ——। (রামায়ণ ও মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডিসি)

৭। এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের নাম হল ——। (ইক্‌টিনাস, ফিডিয়াস, সোফোক্লিস, পেরিক্লিস)

৮। সোফোক্লিস —— নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (হাস্যরসের, করুণরসের)

৯। —— এথেন্সকে 'গোটা গ্রীসের বিদ্যালয়' বলে অভিহিত করেছিলেন। (সক্রেটিস, ফিডিয়াস, পেরিক্লিস)

১০। —— কে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়। (সক্রেটিস, থুকিদিদিস, হেরোডোটাস)

১১। রোম শহরের প্রাচীন অধিবাসীরা নিজেদের —— বলে পরিচয় দিত। (প্লিবিয়ান, প্যাট্রিসিয়ান, ডিমস্, হেলট্, স্পার্টান)

১২। —— পরাজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে —— আর কোন শত্রু রইল না। (ম্যাসিডনের, কার্থেজের, গ্রীসের, এথেন্সের, রোমের)

১৩। 'স্পার্টাকাস বিদ্রোহ' ব্যর্থ হলেও দাসদের বিদ্রোহী মনোভাবে ——। (ভাঁটা পড়েছিল, জোয়ার এসেছিল, ভাঁটা পড়েনি)

১৪। ১৮০ খৃষ্টাব্দে —— মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। (জুলিয়াস সীজারের, অগাষ্টাসের, মার্কাস অরেলিয়াসের)

১৪। —— রাজত্বকালেই প্রাচীন চীনা বর্ণমালা আধুনিক রূপ ধারণ করে। (শাং বংশের, চিন্ বংশের)

১৬। সি হুয়াং তির রাজত্বকালে ——। (চীনের বড় প্রাচীরের কাজ যথেষ্ট এগিয়েছিল, চীনের বড় প্রাচীরের কাজ শেষ হয়)

১৭। বেদে আর্যদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য ——। (রয়েছে, ছিল না)

১৮। প্রথম যুগে আর্যরা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা —— বিভক্ত ছিল। (জনে, জাতিতে)

১৯। ঋক্ বেদের যুগে শ্রেণীভেদ খুব ——। (কঠোর ছিল, কঠোর ছিল না)

২০। মহাভারত পৃথিবীর —— কাব্যগ্রন্থ। (ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম)

২১। বিত্তশালী শ্রেণীর সুবিধার জন্য দাস ও ঋণী ব্যক্তিরা বৌদ্ধ সংঘগুলিতে যোগদানের অনুমতি ——। (পেত, পেত না)

২২। এগুলি কিসের জন্য বিখ্যাত :—(ক) মথুরা (খ) গান্ধার (গ) এথেন্স (ঘ) আলেকজান্দ্রিয়া (ঙ) আন্টিয়োক্।

২৩। এঁদের খ্যাতির কারণ নির্দেশ কর :—(ক) অশোক (খ) কালিদাস (গ) আত্রেয় (ঘ) শীলভদ্র (ঙ) জীবক কোমারভচ্চ (চ) সুশ্রুত (ছ) চরক।

২৪। এই গ্রন্থগুলির লেখকের নাম কি :—(ক) ইণ্ডিকা (খ) পঞ্চসিদ্ধান্তিকা (গ) রঘুবংশ (ঘ) বৌদ্ধরাজ্যসমূহের বিবৃতি (ঙ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (চ) মেঘদূত (ছ) রামায়ণ (জ) কুমারসম্ভব (ঝ) মহাভারত।
